ইসলামকে জানতে হলে

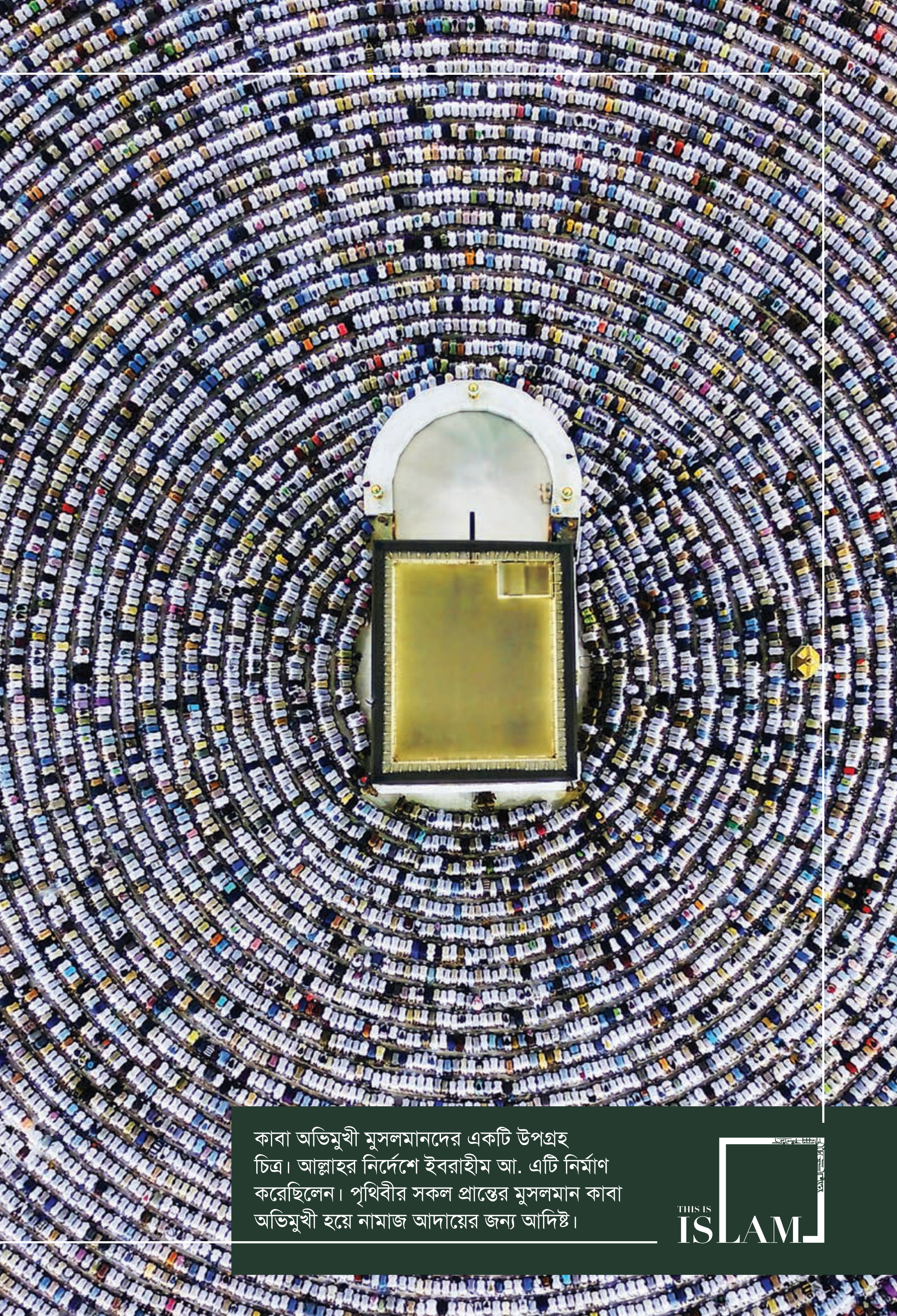

কাবা অভিমুখী মুসলমানদের একটি উপগ্রহ চিত্র। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম আ. এটি নির্মাণ করেছিলেন। পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমান কাবা অভিমুখী হয়ে নামাজ আদায়ের জন্য আদিষ্ট।

THIS IS
ISLAM

© Fahd Salim Bahmmam , 2019

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Bahammam, Fahd

This Islam. / Fahd Bahammam .- Riyadh , 2019

154 p ; 15 X 22 cm

ISBN: 978-603-03-1505-5

1-Islam - General principles II-Title

210 dc 1440/11105

L.D. no. 1440/11105

ISBN: 978-603-03-1505-5

প্রথম প্রকাশ
2023

সর্বস্বত্ব মডার্ন গাইড কোম্পানি
কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামকে জানতে হলে

ফাহাদ সালেম বাহাম্মাম

- চারপাশের গণমাধ্যমগুলো জগতের যে ধর্মটির ওপর সবচেয়ে বেশি হামলা করছে, বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালছে, আরও একটু কাছ থেকে, আরও একটু সূক্ষ্মভাবে একবার কি সেই ধর্মটির ছবিটি দেখা উচিত না?...
- গোটা দুনিয়ার পরিসংখ্যান যাকে বিশ্বের সর্বাধিক বিস্তৃত ও দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে, তাকে কি আরও একটু গভীরভাবে জানা উচিত না?
- আমাদের চারপাশের জগত, ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে অন্যদের মূল্যবোধ ও দর্শন জানার প্রতি কি আপনার কোনো আগ্রহ হয় না?
- আপনি কি একবারের জন্যও নিজেকে মূল সূত্র থেকে ইসলামের নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো জানার সুযোগ দেবেন... তারপরই না সেগুলোকে বিবেক ও যুক্তির আলোকে বিচার করবেন?..

যদি এগুলো কিংবা এর একটি বিষয়ও আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর লাগে, তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আপনাকে সেটা পেতে সহায়তা করতে পারে।

কুরআন কোত্থেকে এসেছে?

82

মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এবং মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই উপর্যুক্ত প্রশ্নটি যুক্তিযুক্তভাবেই পাঠকের মাথায় এসে পড়ে। কেন কুরআনের ব্যাপারে আমরা মুসলমানদের বর্ণনা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য? এ ব্যাপারে কি কিছু প্রশ্ন তুলতে পারি না আমরা?

বিষয়-সূচি

কিছু ব্যাকুল জিজ্ঞাসা — 12
- ইসলাম ধর্ম
- 'ইসলাম' শব্দের অর্থ
- ইসলাম সকল নবী-রাসূলের ধর্ম

ইসলামের বিশ্বজনীনতা — 16
- পরিবেশের যত্ন ঈমানের অঙ্গ
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম
- যোগাযোগ ও সহযোগিতার ধর্ম
- ইসলাম মানবজীবনের সব দিক স্পর্শ করে

স্রষ্টা একজন.... উপাস্য একজন — 30
- প্রকৃতির আইন ও শরীয়তের আইন
- ইসলামে পুরোহিততন্ত্রের স্থান নেই
- ইসলামে প্রবেশের কি বিশেষ আচার রয়েছে?

রাসূল আসলে কারা? — 38
- রাসূলগণ ছিলেন মানুষ
- রাসূলদের মর্যাদার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা
- রাসূলদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি — 42

ইসলামের রাসূলের পরিচয় — 48
- ইসলামের রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সত্যনিষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ — 54

মুহাম্মাদ রাসূলের চরিত্র-মাধুর্যের কাহিনী —— 60

- বিনয়
- দয়া ও অনুগ্রহ
- ন্যায়-নীতি
- ধৈর্য ও সহনশীলতা
- উদারতা ও বদান্যতা
- জগতের প্রতি নির্লিপ্ততা ও নিরাসক্তি
- ওয়াদা পূরণ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা

মুহাম্মাদ (সা.) এর নির্বাচিত বাণী —— 70

পবিত্র কুরআন : ইসলামের নিরন্তন মুজিযা —— 76

- কুরআন সংরক্ষণের অলৌকিকতা
- বর্ণনাগত ও মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা

কুরআন কোত্থেকে এসেছে? —— 82

- কিছু পুরনো অভিযোগ
- কুরআনকে মুহাম্মাদের প্রতিভার প্রকাশ বলতে বাধা কোথায়?
- কুরআন কি মুহাম্মাদের হাতে পরিমার্জিত বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের সংকলিত রূপ?
- অসামান্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা
- সূরা ফাতিহা

ইসলামের ইবাদতের মর্মকথা কী? —— 92

- ইসলামের ভিত্তিসমূহ
- ইবাদতের নির্দেশ কেন? কেন এত পরীক্ষা?
- নামাজ
- জাকাত
- রোজা
- হজ্জ

ইসলামে পরিবার —— 108

- ইসলাম বিবাহ ও পরিবার গঠনে জোর দিয়েছে
- ইসলাম পরিবারের নারী-পুরুষ প্রত্যেক সদস্যকে পূর্ণ সম্মান দিয়েছে
- ইসলাম সন্তানদের ভেতরে মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করেছে। মৃত্যু পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্নবান ও অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছে
- সন্তান-সন্ততির অধিকার সুরক্ষা ও তাদের মাঝে ইনসাফের অপরিহার্যতা ঘোষণা করেছে
- মুসলিমের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যাবশ্যক

ইসলামে পরিবার

108

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের কাছে পরিবার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, কয়েকজন মানুষ একটি ঘরে বসবাস করবে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে সেই ঘরের চাবি থাকবে!

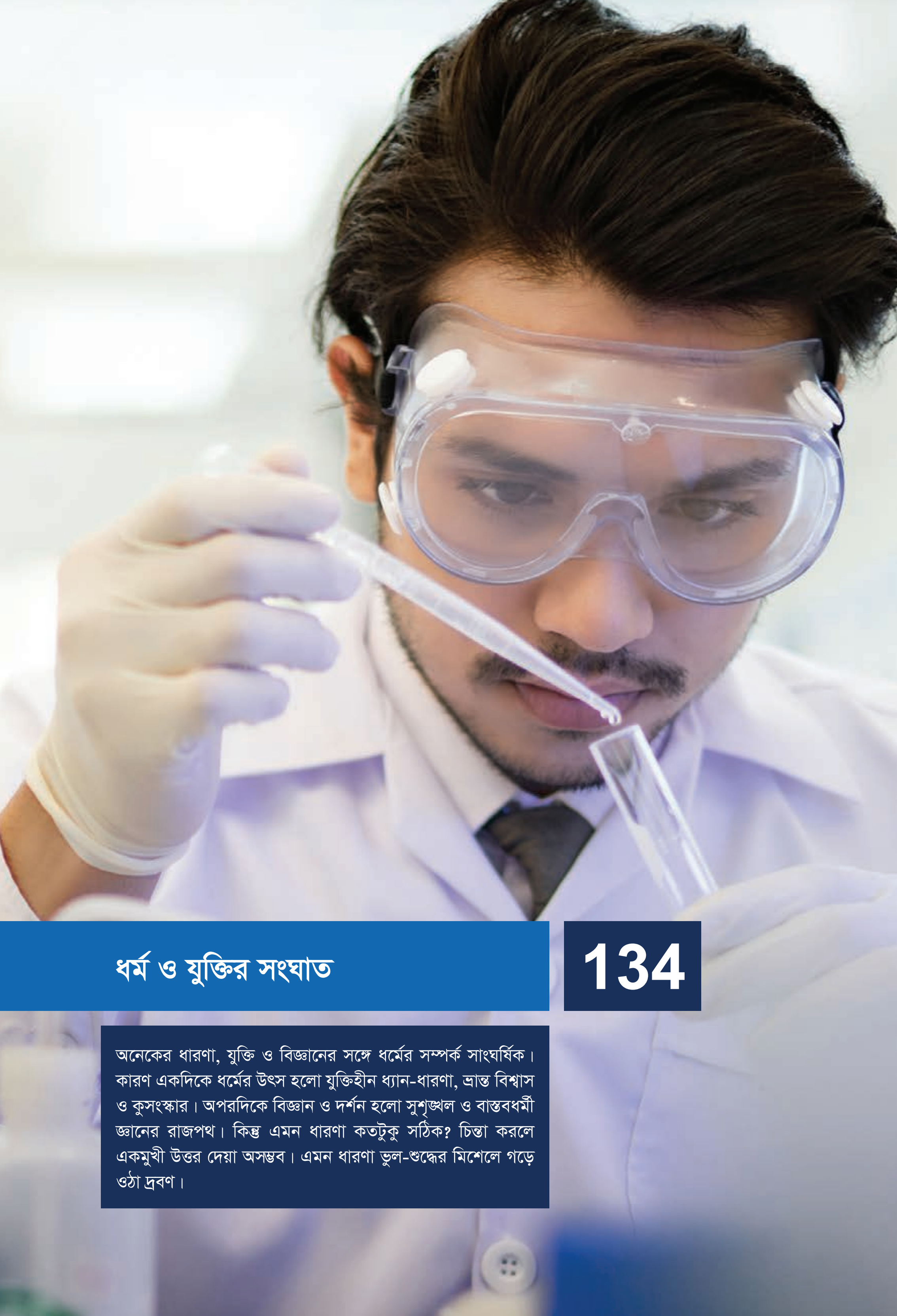

ধর্ম ও যুক্তির সংঘাত

134

অনেকের ধারণা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক। কারণ একদিকে ধর্মের উৎস হলো যুক্তিহীন ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার। অপরদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন হলো সুশৃঙ্খল ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানের রাজপথ। কিন্তু এমন ধারণা কতটুকু সঠিক? চিন্তা করলে একমুখী উত্তর দেয়া অসম্ভব। এমন ধারণা ভুল-শুদ্ধের মিশেলে গড়ে ওঠা দ্রবণ।

ইসলামে নারীর মর্যাদা —— 114

- নারীকে ইসলাম কীভাবে সম্মান করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ
- ইসলাম যেসব নারীর দেখাশোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে
- ইসলামে নারী-পুরুষে কোনো সংঘাত নেই
- নারী-পুরুষের সম্পর্ক
- ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি
- অপরিচিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের নীতিমালা
- পরপুরুষের সামনে নারীর হিজাব আবশ্যক হওয়ার তাৎপর্য

ইসলামে পানাহারের বিধান —— 124

- শূকর
- মাদক ও অ্যালকোহল
- মদ ও অ্যালকোহলের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

গোনাহ ও তওবা —— 130

ধর্ম ও যুক্তির সংঘাত —— 134

- কুরআনের ব্যাখ্যায় সুস্থচিন্তার যত অন্তরায়

ইসলাম শান্তির ধর্ম —— 140

- মানুষকে কি ইসলামে ঢুকতে বাধ্য করা হয়েছে?
- ইসলাম বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ধর্ম

ইসলাম ও কিছু মুসলমানের জীবনের বৈসাদৃশ্য —— 146

- নতুন দিগন্ত

কিছু ব্যাকুল জিজ্ঞাসা

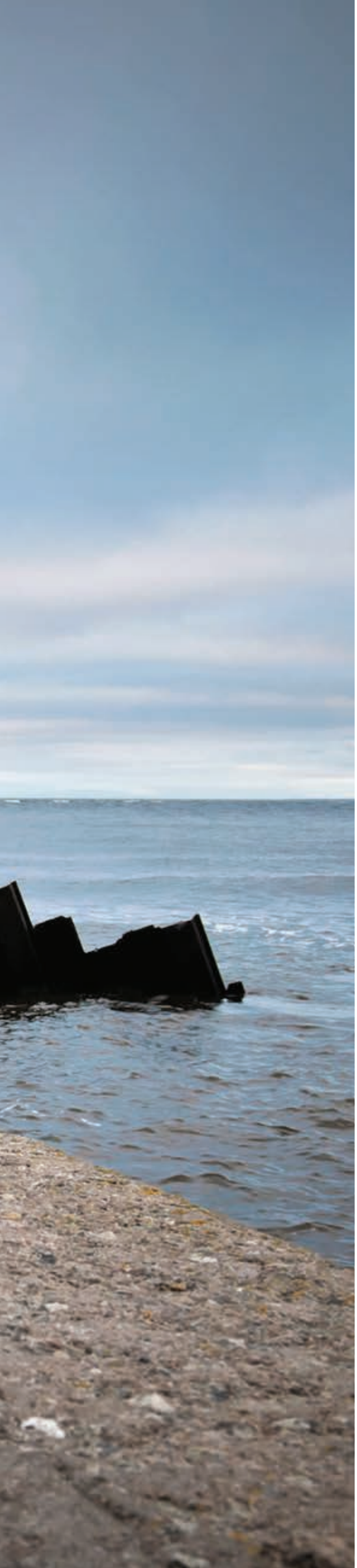

আমাদের

আমাদের ভেতর এমন কে আছে যে জীবনের চলতি পথে কখনও থমকে দাঁড়ায়নি? জীবনের কিছু জটিল ও কুটিল প্রশ্ন তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে তোলেনি? কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করেনি: আমি কে? কোত্থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? আমার গন্তব্য কোন দিকে? আর এই জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? সবকিছুর অনিবার্য পরিণতি যদি মৃত্যু, মৃত্তিকা আর ধ্বংসই হয়ে থাকে, তবে কেন জীবনের জন্য এত তৃষ্ণা? জগতের পেছনে এত ছুটে চলা?

ইসলাম ও অন্যান্য আসমানী ধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন, গোটা পৃথিবীর একজন ন্যায়পরায়ণ সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং এই পার্থিব জীবন শেষে আরেকটি অপার্থিব জীবন রয়েছে। যেখানে প্রত্যেক সৎকর্মশীল মানুষ তার সৎ কর্মের পুরস্কার পাবেন আর প্রত্যেক অসৎ মানুষ তার অসৎ কর্মের প্রতিদান পাবে– এই বিশ্বাস ছাড়া জগৎ সংসারে মানুষের জীবন নিতান্তই খেলো ও অর্থহীন, নিছক যন্ত্রণা ও শাস্তি এবং এক নিষ্ফল প্রতিযোগিতা।

> জীবন-সংগ্রামের উত্থান-পতন, অভাব-অনটনের প্রকৃত কারণ, সঠিক-বেঠিক, জীবনে ধেঁয়ে আসা তুফান ও প্রতিকূলতা- আপনি এসব কিছু তখনই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন, যখন এক দয়ালু, ইনসাফগার, প্রজ্ঞাময় মহা ক্ষমতাশালী সৃষ্টিকর্তায় আপনার গভীর বিশ্বাস থাকবে।

বস্তুত মানব জীবনের যাবতীয় টানাপোড়েন, জীবন ধারণের নানামাত্রিক জটিলতার তাৎপর্য এবং ঠিক-বেঠিক ও বিড়ম্বনা-দুর্ভোগগুলো বোঝা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমরা এক ন্যায়-পরায়ণ, প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী স্রষ্টায় বিশ্বাস করবো, যিনি এ জীবনের একটি উপসংহার রেখেছেন। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মফল ভোগ করবে।

আর ঠিক তখনই জীবন-সংসারে ইনসাফ, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সততা, ধৈর্য, দয়া ও অনুগ্রহসহ যেসব মূল্যবোধে আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি এবং যেগুলোর দিকে প্রতিনিয়ত একে অপরকে ডাকি, সেগুলো নিখাদ বাস্তবতা হয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়বে। জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো অর্থপূর্ণ হবে। অর্জনগুলো স্বাদযুক্ত হবে। আর মিষ্টতা অনুভূত হবে ধৈর্যের।

আমরা দেখি এদিকেই এদিকে ইঙ্গিত করেছে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন কারীম। মহান আল্লাহ তাতে আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের কথা : 'আর তারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। (এবং বলে) হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি মহাপবিত্র'। (আলে ইমরান : ১৯১)

> আরবি ভাষায় 'ইসলাম' শব্দটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: আত্মসমর্পণ করা, সঁপে দেয়া, আনুগত্য, নিষ্ঠা, নিরাপত্তা, সান্ত্বনা ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্ম

জগতের অধিকাংশ ধর্মই কোনো বিশেষ ব্যক্তি, জাতি কিংবা অঞ্চলের নামে নাম পেয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে ওই ধর্মটি বিকশিত হয়েছে। একারণে আমরা দেখতে পাই 'খ্রিস্টধর্ম' যিশু খ্রিস্ট (ঈসা মাসীহ আ.) এর নাম থেকে এসেছে। 'ইহুদিধর্ম' এর নাম এসেছে 'ইহুদি' গোত্রের নাম থেকে। 'বৌদ্ধধর্ম' প্রসিদ্ধি পেয়েছে এ ধর্মের প্রবর্তক 'বুদ্ধ'র নামে। 'হিন্দুধর্ম' এসেছে 'হিন্দ' তথা ভারতবর্ষের নাম থেকে।

পক্ষান্তরে ইসলাম কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সম্প্রদায়, বংশ কিংবা জাতিগোষ্ঠীর নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। কেননা ইসলাম কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে বিশিষ্ট নয় যে তার সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করা হবে। কোনো মানুষের উদ্ভাবন নয় যে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে শুধুই 'ইসলাম'।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ

আরবী অভিধানে গেলে আমরা দেখব, 'ইসলাম' শব্দটি মূলত অনেকগুলো অর্থ বহন করে। যথা– সমর্পণ, বশ্যতা, আনুগত্য, নিষ্ঠা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি ইত্যাদি।

পরিভাষায় ইসলাম হলো: জগতের সব ধরনের বশ্যতা ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা সুমহান প্রভুর সমীপে নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে ইসলামের এ অর্থই স্পষ্ট করা হয়েছে।

কুরআন বলছে, যে ব্যক্তি স্বীয় তনুমন নিয়ে আল্লাহমুখী হলো; তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিজেকে তাঁর প্রতি সমর্পণ করলো; তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চললো; সে মুক্তির রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল ও মজবুত করল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। ফলে সে জগতের সকল কল্যাণ লাভ করলো। (লুকমান : ২২, ভাবার্থ)

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করা এবং তাঁর ব্যতীত জগতের সব ধরনের দাসত্ব ও বশ্যতা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা দেয়া। আর সেই হলো মুসলিম যে একান্তভাবে তাঁরই ইবাদত করে, আত্মিক আত্মনিবেদনের মধ্যে বাস করে এবং সবার মধ্যে আত্মনিবেদনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

এখন প্রশ্ন সকল নবী-রাসূল কি এই বার্তা নিয়েই এসেছেন?

ইসলাম সকল নবী-রাসূলের ধর্ম

কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে, বিগত দিনগুলোতে প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর কাছে একজন করে রাসূল পাঠানো হয়েছে। যিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উদ্দেশে ঘোষণা করছেন, 'আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর জগতের প্রত্যেক জাতির মাঝেই সতর্ককারী বিগত হয়েছেন।' (ফাতির : ২৪) সুতরাং বোঝা গেলো জগতের প্রত্যেক নবী-রাসূলই সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন। তাদের সবার ঈমান ও বিশ্বাসের মৌলকথা এবং বিধান ও আখলাকের মূলনীতিও ছিলো অভিন্ন।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে দুনিয়ার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) যেই ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন সেটি কোনো নতুন ধর্ম ছিল না; বরং সেটা ছিল জগতের সকল নবী-রাসূলের নিয়ে আসা ধর্মের উপসংহার ও বিস্তৃত রূপ। আর সে কারণেই পবিত্র কুরআন মুসলিমদেরকে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, ঈসাসহ পূর্বযুগের নবীগণের মতো করে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছে। (বাকারা : ১৩৬)

আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন আমাদের কাছে যখন ইবরাহীম এর পক্ষ থেকে স্বীয় সন্তানদের প্রতি এবং মুমূর্ষু অবস্থায় ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক স্বীয় সন্তানদের প্রতি অন্তিম উপদেশ দানের ঘটনা বর্ণনা করেছে, তখনও ইসলামের কথাই এসেছে। তারা স্বীয় সন্তানদের বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্য ধর্ম ইসলামকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকো। (বাকারা : ১৩২)

সুতরাং ইসলাম ধর্ম হলো জগতের সকল নবী-রাসূলের ধর্ম। যার কারণে যুগে যুগে সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ ধর্মের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও বিস্তারিত নিয়মাবলিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন থাকলেও মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ক্ষেত্রে কখনও কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এভাবেই নবী-রাসূলদের ধারাবাহিকতা শেষে এক পর্যায়ে আগমন করেছেন সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এবং ইসলামী শরীয়তকে গোটা মানব জাতির ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

আর এ কারণেই পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছে যে, জগতের সকল মানুষের জন্য মনোনীত ধর্ম একটিই- ইসলাম। তাহলে আসমানী ধর্মগুলোর মাঝেও মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কেন? বস্তুত এসব মতপার্থক্যের কারণ হলো সেসব ধর্মানুসারীদের বিকৃতি। নবী-রাসূলদের প্রকৃত ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়ার ফলাফল। (আলে ইমরান : ১৯)

> ইসলাম যেমন কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে সম্পৃক্ত নয়; তেমনি কোনো বিশেষ গোত্র, জাতি বা সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সম্পৃক্ত নয়। কারণ ইসলাম জগতের নির্দিষ্ট কোনো জাতিসত্তর ধর্ম নয়। পৃথিবীর কোনো মানুষও এক প্রবর্তক নয়। আর সেকারণেই এর নাম 'ইসলাম'।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা

ইসলামের

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন আরবদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) আরবদের মাঝেই প্রেরিত হয়েছেন। অথচ আশ্চর্য হলেও সত্য যে, কুরআনের কোথাও 'আরব' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি! আজকের দুনিয়ায় সমগ্র মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর ভেতরে আরব জাতি নিতান্তই সংখ্যালঘুর পর্যায়ে পড়ে। মুসলিম জনসংখ্যার হিসেবে তারা মাত্র ২০ ভাগেরও কম। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হলো সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া। বরং কেবল ভারতের মুসলিমদের সংখ্যাও- যেখানে তারা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত- সবচেয়ে বড় আরব রাষ্ট্রের মুসলিমদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

এর কারণ হলো ইসলাম কেবল আরব জাতির জন্য আসেনি; বরং পৃথিবীর সকল দেশ ও শহর, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে গোটা জগতবাসীর জন্য অনুগ্রহ ও আলোকবর্তিকা হিসেবে এসেছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : আমি আপনাকে গোটা জগতবাসীর জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া : ১০৭)

ইসলাম মানব-বৈচিত্র্যের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে, যা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো মতবাদের জানা ছিল না। যার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো জাতিগোষ্ঠীর পূর্ব-পরিচয় ছিল না।

উদাহরণ স্বরূপ চলুন আমরা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের দিকে গভীরভাবে তাকাই। যেখানে কুরআন শুধু আরব কিংবা মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করছে না। বরং সকল জাত-পাত ও ধর্মবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে গোটা মানবজাতির উদ্দেশে কুরআন ঘোষণা করছে– হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের ভেতরে সে সর্বোত্তম যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ। (হুজুরাত : ১৩)

এখানে কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝাচ্ছে যে, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ এক পিতামাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। আজ মানুষের মাঝে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় সেটার সৃষ্টি একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়; পারস্পরিক পরিচয়, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার জন্য। শ্রেষ্ঠ হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর উপাসনা করে এবং তাঁকে ভয় করে।

> ইসলাম মানব-বৈচিত্র্যের এমন বিস্ময়কর ধারণা পেশ করেছে, যা পৃথিবীর আর কোনো জীবনব্যবস্থার জানা ছিল না। পৃথিবীর কোনো জাতি এর সঙ্গে পূর্বপরিচিত ছিল না।

বরং আরও আগে বেড়ে কুরআন আমাদেরকে বলছে যে, মানুষের মাঝে গোত্র ও বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির এই যে বৈচিত্র্য সেটা আল্লাহর তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, তাঁর শক্তির কারিশমা এবং জগত-সংসারে তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টির নিদর্শন। এই যে বিস্ময়কর বিচিত্র সৃষ্টি, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির তুলনায় তা মোটেও ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু এ অপার বিস্ময় কেবল জ্ঞানী ও ভাবুকদের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। (রুম : ২২ ভাবার্থ)

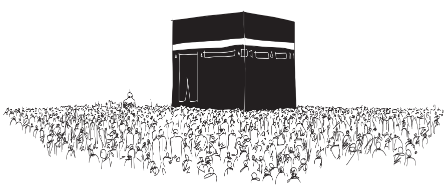

মুহাম্মাদ সা. ইসলামের রাসূল

‘হে লোকসকল! মনে রেখো, তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পিতাও একজন। মনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর লালের কিংবা লালের ওপর কালোর কেনো বাহাদুরি নেই। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে ‘খোদাভীতি’।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা

যেটা সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমতা ঘোষণা করে।

৬৩০ খ্রি. — ১৯৪৮ খ্রি.

আধুনিক পৃথিবীতে স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অংশীদারিত্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও স্বীকৃতি আসে ১৯৪৮ সালে। এটার বাস্তবায়ন শুরু হয় আরও পরে। অথচ মানবাধিকারের এই ঘোষণা ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছিল আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। সেদিন ছিল গোটা মানব ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা। মানুষকে সেদিন তিনি সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে লোকসকল! মনে রেখো তোমাদের সকলের প্রভু একজন। তোমাদের সকলের পিতাও একজন। মনে রেখো অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর লালের কিংবা লালের ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড আল্লাহভীতি। (আহমদ : ২৩৪৮৯)

পরিবেশের যত্ন ঈমানের অঙ্গ

জগতের কোনো কোনো ধর্ম-দর্শনে মানুষকে গোটা সৃষ্টি জগতের ভেতরে নিরংকুশ সরদার হিসেবে দেখা হয়েছে। সে নিজের সুবিধা, পছন্দ ও খেয়াল-খুশিমতো যা ইচ্ছা তাই করবে। কোনো কিছুর পরোয়া করবে না। তার এই ইচ্ছার ছড়ি চালাতে গিয়ে পৃথিবী বিরান হয়ে যাক, সৃষ্টির বিনাশ ঘটুক- এসব তার দেখার বিষয় নয়। এই মতবাদের ঠিক বিপরীতে কোনো কোনো ধর্ম-দর্শনে মানুষের আলাদা কোনো মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়নি। গোটা সৃষ্টির মতো মানুষও একটি নিছক সৃষ্টি ভেবে তাকে ছোট করা হয়েছে। তাহলে পরস্পর বিপরীতমুখী এসব ধর্ম-দর্শনের ভিড়ে ইসলাম কী বলে মানুষের ব্যাপারে? ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্কের রূপরেখা কী?

ইসলাম পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে ঈমানের ভিত্তিতে দেখেছে। আর সে কারণেই একজন মানুষের অপর মানুষের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে কী সম্পর্ক হবে এবং সেটা কীভাবে সুদৃঢ় হবে- এসব বিষয় সবিস্তারে বাতলে দিয়েছে।

পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কুরআনী নির্দেশনার সর্বপ্রথম, সবচেয়ে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন দিকটিই হচ্ছে ভারসাম্যতা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট সৃষ্টির চেয়ে তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। (ইসরা : ৭০)। পৃথিবী ও অন্যান্য সৃষ্টিকুলকে মানুষের অধীন ও বশীভূত করে দিয়েছেন। যাতে করে মানুষ সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং সেগুলোর দেখভাল করে। (ইবরাহীম : ৩২-৩৩) সুতরাং মানুষ অপরাপর অজস্র সৃষ্টির মতো কেবল সৃষ্টির একটি প্রকার নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সম্মানিত ও মহান সৃষ্টি। প্রকৃতিকে তার সেবার অধীন করে দেয়া হয়েছে। যাতে সে তাকে কাজে লাগাতে পারে। (বাকারা : ২৯)

কিন্তু এর মানে এই নয় যে কুরআন মানুষকে এই পৃথিবীর নিরংকুশ মালিক বানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে। কারণ কুরআন মানুষকে যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে সেটা তাকে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার অনুমতি দেয় না। কেননা এগুলোর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী মূলত এগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। তিনি মানুষকে এই পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। এগুলোর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার দিয়েছেন। প্রগতি ও সমৃদ্ধির চেষ্টার আদেশ দিয়েছেন। তবে অন্য মানুষ কিংবা অপর কোনো সৃষ্টির ক্ষতি করে নয় এই শর্তে। (হূদ : ৬১; বাকারা : ৩০)

মানুষ ও তার চারপাশের এই পৃথিবীর মাঝে এই যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম, এটার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে অসংখ্য বিধি-বিধান ও নীতি-নৈতিকতা। দিয়েছে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. প্রাণীকূলের সুরক্ষা

প্রাণী অধিকার পরিপালনের নির্দেশ সংবলিত অসংখ্য বক্তব্য এসেছে নবী মুহাম্মাদ (সা.) থেকে। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের বিনিময়ে ঘোষণা করা হয়েছে পরকালে বিশাল পুরস্কারের। অপরদিকে এগুলোকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কঠোর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

প্রাণী অধিকার রক্ষায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংস্থা 'রয়্যাল অর্গানাইজেশন ফর অ্যানিম্যাল রাইটস' আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৪ সালে, বৃটেনে। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে এই বৃটেনেই আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। অথচ ইসলামে আমরা দেখতে পাই– আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগেই প্রাণী প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন অবৈধ ও অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর অসংখ্য বাণী ও বাস্তব কাজের উদাহরণ রয়েছে। পশু-পাখিকে না খাইয়ে ক্ষুধার্ত রাখা, শাস্তি দেয়া, সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেয়া, খেলাচ্ছলে এগুলোকে কষ্ট দেয়া কিংবা পশু-পাখির মুখে আঘাত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিকহের গ্রন্থসমূহ এমন অসংখ্য উদাহরণে ভরপুর।

পাঠক প্রাণীর প্রতি ইসলামের মমতার চূড়ান্ত সীমা দেখতে পাবেন একটি হাদীসে, যেখানে নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'এক ব্যভিচারী নারী একদিন একটি পিপাসার্ত কুকুর দেখতে পায়। পিপাসার কারণে কুকুরটি মরে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। অবস্থা দেখে তার দয়া হয়। পায়ের মোজা খুলে সেটা দিয়ে একটি কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করায়। এই কাজের কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (অথচ ব্যভিচার ইসলামের দৃষ্টিতে চরম গর্হিত অপরাধ ও মারাত্মকভাবে নিষিদ্ধ)। (বুখারী : ৩২৮০)

পশু-পাখির প্রতি অন্যায় আচরণকে আইন করে সর্বপথম নিষিদ্ধ করা হয়েছে বৃটেনে ১৯৪৯ সালে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম পশু-পাখি অধিকার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ সালে।

অথচ ইসলাম ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পশু-পাখিকে না খাইয়ে রাখা, কষ্ট দেয়া এবং সেগুলোর ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়াকে নিষিদ্ধ করেছে।

২. উদ্ভিদজগতের সুরক্ষা

উদ্ভিদ ও ফল-ফসলের যত্ন নিতে ইসলাম দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। হোক সেটা নিজের অথবা এ পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ কিংবা প্রাণীর কল্যাণের জন্য।

একটি হাদীসে নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ফসল চাষ করলো কিংবা সৃষ্টির জন্য উপকারী কোনো বৃক্ষ রোপণে অংশ নিলো, এরপর তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পশু বা পাখি খাদ্য সংগ্রহ করলো, তবে এটা সেই ব্যক্তির জন্য সদকা (সৎকর্ম) হবে। (বুখারী : ২৩২০)

শুধু তাই নয়; বরং জীবনের চরম সংকটঘন ও অন্ধকার মুহূর্তেও প্রিয় নবীজী একজন মুসলিমকে পরিবেশের যত্ন এবং ভূপৃষ্ঠের সমৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হোক সে প্রচেষ্টা কোনো কাজে না আসুক। তিনি বলেছেন, যদি তোমাদের কারও হাতে একটি চারাগাছ থাকে আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেয়ামত এসে যায়, তবে সম্ভব হলে সে যেন চারাটি মাটিতে রোপণ করে ফেলে। কারণ এটা তার জন্য একটি সদকা হবে। (আহমদ : ১২৯৮১)

এভাবেই প্রিয় নবী (সা.) চরম সংকটকালেও পৃথিবীর বিনির্মাণ ও সমৃদ্ধির কাজকে শরীয়তের ইপ্সিত কর্ম ও ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই কোনো অবস্থাতেই এটাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

৩. প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা

ইসলাম পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট, দূষণ কিংবা এর ক্ষতি করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। পরিবেশের সঙ্গে মানব জীবনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণ গাইডলাইন পেশ করেছে। যার মূলনীতি হচ্ছে : 'প্রতিকারের আগে প্রতিরোধ'। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ হলো, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর ইসলামের গুরুত্বারোপ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, এসব সম্পদ নষ্ট কিংবা দূষণকে অবৈধ ও অপরাধ সাব্যস্ত করা ইত্যাদি।

- ইসলাম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। এর শীর্ষে রয়েছে পানি। ফলে দেখা যাচ্ছে উযুর মতো ইবাদতমূলক একটি কাজের ক্ষেত্রেও অপচয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর তা হলো সালাতের আগে নির্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ ধৌত করা।

> ইসলামের রাসূলের ভাষ্যমতে, পরিবেশের যত্ন নেয়া এবং সবধরনের দূষণ থেকে পরিবেশ মুক্তরাখার কাজে অংশগ্রহণণ ঈমানের একটি অংশ।

- ইসলাম সমাজের ক্ষমতাশালীদের প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট বাণিজ্য করতে চরমভাবে নিষেধ করেছে। কারণ এর ফলে সমাজের বাকি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ইসলামে পানি (প্রাকৃতিক সম্পদ), আগুন (পাওয়ার) ও ঘাষ-লতাপাতার (খাদ্য) ক্ষেত্রে মনোপলি তৈরি করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। (আবু দাউদ : ৩৪৭৭)
- ইসলাম আমাদের চারপাশের পরিবেশ নষ্ট করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। উদাহরণত, স্থির পানিতে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। কারণ এটা পানিকে দূষিত করে ফেলে। পথে-ঘাটে কিংবা বৃক্ষের ছায়ায় মলত্যাগ করা নিষিদ্ধ। কারণ এসব জায়গায় মানুষ চলাচল করে। পথক্লান্ত পথিক একটুখানি বিশ্রামের আশায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

পরিবেশ সুরক্ষায় ইসলামে যতখানি গুরুত্ব রয়েছে সে তুলনায় এগুলো নিতান্তই সামান্য কিছু উদাহরণ। অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই ইসলামের রাসূলই পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে পরিবেশের সংস্কার কাজে অংশগ্রহণকে কেবল ভালো কাজ হিসেবেই মূল্যায়ন করেননি; বরং এটাকে ঈমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন'! (মুসলিম : ৩৫)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্ম

পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে শব্দটি নবীজী (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেটা ছিল ‘ইক্বরা’ (আপনি পড়ুন)। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ কুরআন কারীমে এবং নবীজী মুহাম্মাদ (সা.) এর বিভিন্ন হাদীসে মানুষের জন্য উপকারী সব ধরনের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের বিশেষ সহায়তা ও সমর্থনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বরং এক পর্যায়ে জ্ঞানের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করাকে জান্নাতের পথ অবলম্বনের মতো বলা হয়েছে। নবীজী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে কোনো একটি পথে চলতে শুরু করলো, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ খুলে দিবেন’। (মুসলিম : ২৬৯৯)

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, ‘ইবাদতে নিমগ্ন একজন আবেদের তুলনায় একজন আলেমের মর্যাদা ঠিক তত বড়, সমাজের একজন সাধারণতর মানুষের তুলনায় আল্লাহর রাসূল (সা.) এর মর্যাদা যত বড়’। (তিরমিযী : ২৬৮৫)

আর এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত বলতে কিছু পাওয়া যায় না, যেমনটা পাওয়া যায় অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসে। মুসলিম উলামায়ে কিরাম অন্ধকার যুগের খ্রিস্টান পাদরীদের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিস্কার ও চিন্তাধারার ওপর কখনও খড়্গহস্ত হননি। উল্টো ধর্মই ছিল বিজ্ঞানের পাদপ্রদীপ। প্রধান সহায়ক ও আহ্বায়ক। ইসলামের মসজিদগুলো ছিল মানবতার জন্য কল্যাণকর সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর মিনার।

সুতরাং অবাক হওয়ার কিছু নেই যখন আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখি যে, অধিকাংশ মুসলিম বিজ্ঞানীর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল পবিত্র কুরআন পড়া ও মুখস্থ করাসহ নিতান্তই ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে। পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং নিজস্ব বিশেষায়িত পরিমণ্ডলে প্রতিভার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কল্যাণকর বিষয়সমূহ শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। তাকে সম্মান ও সমীহের সবচেয়ে দামি মুকুট পরিয়েছেন। নবীজী (সা.) বলেছেন, যিনি মানুষকে ভালো কিছু শিক্ষা দেন, তার জন্য গোটা সৃষ্টিজগত দুআ করে’। (তিরমিযী : ২৬৮৫)

অধিকাংশ মুসলিম পরিবেশ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ তাদের জীবন শুরু করেছেন সাধারণত কুরআন কারীমের মাধ্যমে। আর এই কুরআন তাদেরকে অন্যান্য জ্ঞানেও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রতি আহ্বান করেছে।

বড় বড় মুসলিম বিজ্ঞানীগণ

১. আল-খাওয়ারিজমী (৭৯০-৮৫০ বাগদাদ) : গণিতজ্ঞ, প্রকৌশল-বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ। বীজগণিতের প্রবর্তক। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উপরন্তু তাঁর ব্যবহার করা বিভিন্ন আরবী শব্দ যথা 'আল-জাবর' (আল-জেবরা), 'সিফর' (জিরো) ইত্যাদি ল্যাটিন ভাষায় প্রবেশ করেছে।

২. ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ কায়রো) : পদার্থবিদ ও প্রকৌশল বিজ্ঞানী। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি। অপটিক বিজ্ঞানে বিশ্বসেরা অবদান রেখেছেন। ক্যামেরা উদ্ভাবনের মূলনীতিও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায় সর্বপ্রথম। অধিকাংশ গবেষক বিশ্বাস করেন, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত 'ক্যামেরা' শব্দটি মূলত আরবী শব্দ 'কুমরা' এর বিকৃত রূপ। 'কুমরা' হলো ইবনে হাইসামের আবিস্কৃত 'আলোকক্ষে'র নাম।

৩. আল বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খাওয়ারিজম) : বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে পৃথিবী তার কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হয়। এভাবে তিনি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

৪.আল-যাহরাভী (৯৩৬-১০১৩ আন্দালুস) : বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ও শল্যবিদ (সার্জন)। সার্জারি চিকিৎসা তাঁর হাত ধরেই বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে শত শত সার্জারি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এসব গ্রন্থই পরবর্তীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন ভাষায় চিকিৎসা ও সার্জারির প্রধান উৎসগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল।

৫. ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭, বুখারা) : আধুনিক বিজ্ঞানে তিনি **Avicenna** নামে পরিচিত। জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বর্ণনায় তিনি নিজের যুগকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তার মেডিকেল গবেষণাগুলোতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমনসব সূক্ষ্ম ফলাফলে উপনীত হতে পেরেছিলেন যা সে যুগে কারও কল্পনাতেও ছিল না। বরং আজও সেগুলো পৃথিবীর বিস্ময়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তাঁর লেখা 'আল-কানূন' গ্রন্থ। প্রায় সাত শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থটিই ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান রেফারেন্স। এখানেই শেষ নয়; সপ্তাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়নো হতো!

চিকিৎসা শাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করার পরে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মানবিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। ফলে তিনি রোগীদের ফ্রি চিকিৎসা দান করতেন।

৬. ইবনে নাফীস (১২১৩:১২৮৮ দামেশক) : ইসলামী ফিকাহ ও শরীয়তের আলেম হওয়ার সত্ত্বেও তিনি ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একজন। ছিলেন ইতিহাসের বিখ্যাত ফিজিওলজিস্ট। তিনিই মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি এমন অসংখ্য থিওরির জন্ম দেন, আজও যার অনেকগুলো সক্রিয় ও জীবন্ত।

ইসলাম মানবজীবনের সব দিক স্পর্শ করে :

পৃথিবীর অসংখ্য ধর্মের অনুসারীরা ধর্ম বলতে কেবল কিছু রীতি-নীতি, পালা-পার্বণ এবং নানান প্রথা ও উৎসবের সমষ্টি মনে করে। সে কারণেই যখন বলা হয় যে ইসলাম কেবল কিছু প্রথা ও উৎসবের নাম নয়- তখন সেটা তাদের কাছে বেশ বিস্ময় ও কৌতূহল তৈরি করে।

ইসলাম কেবল কোনো আধ্যাত্মিক মার্গ নয় যেটা মুসলিমরা মসজিদের দরজা বন্ধ করে নামাজ ও যিকিরের মধ্য দিয়ে পালন করতে থাকবে।

এটা কেবল কিছু বিশ্বাস, চিন্তা-ধারা ও শূন্যগর্ভ দর্শনের সমষ্টিও নয়।

আর নয় কেবল কোনো পূর্ণ পরিবেশ কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম।

নয় কেবল সমাজ কিংবা সরকার ব্যবস্থার কিছু নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি।

একইভাবে ইসলাম নয় কেবল কিছু নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সচ্চরিত্র ও পারস্পরিক সদাচারণের নির্দেশিকা।

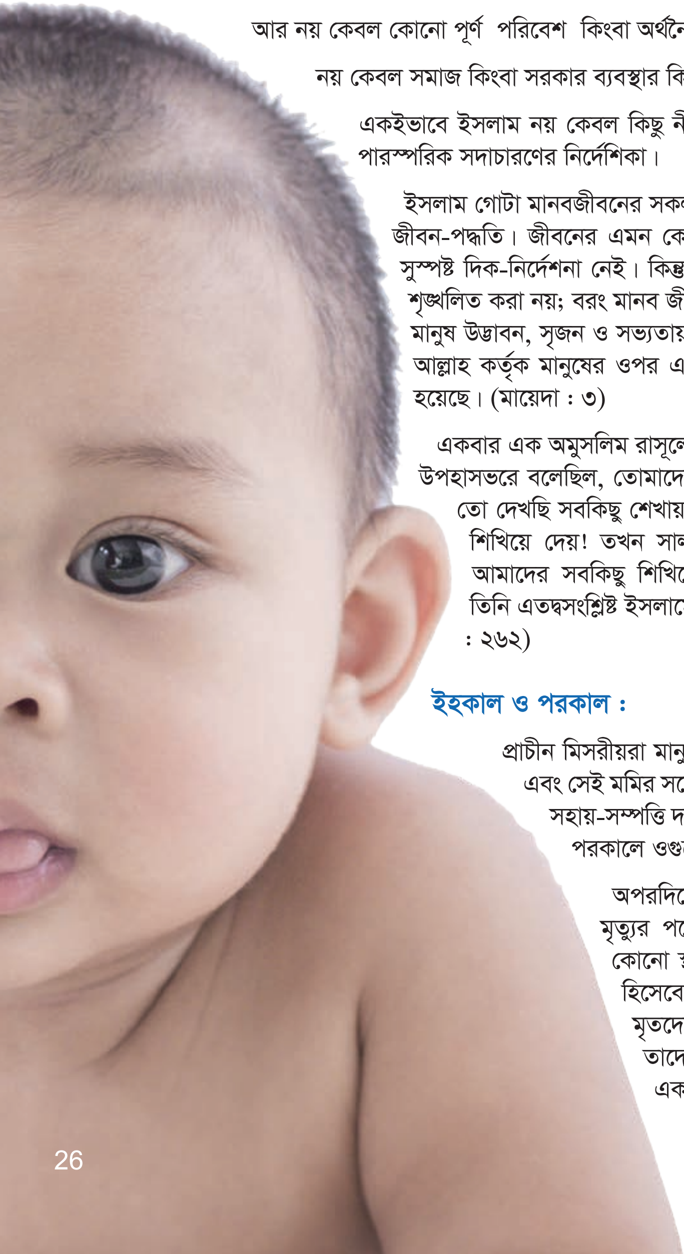

ইসলাম গোটা মানবজীবনের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি। জীবনের এমন কেনো দিক নেই যা সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই। কিন্তু এর অর্থ কখনোই মানুষের স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত করা নয়; বরং মানব জীবনকে সহজ করে তোলা। যাতে করে মানুষ উদ্ভাবন, সৃজন ও সভ্যতায় নিবিষ্ট হতে পারে। কুরআনে এটাকে আল্লাহ কর্তৃক মানুষের ওপর এক শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। (মায়েদা : ৩)

একবার এক অমুসলিম রাসূলের সাহাবী সালমান ফারসী (রা.)– কে উপহাসভরে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গী (উদ্দেশ্য রাসূল) তোমাদেরকে তো দেখছি সবকিছু শেখায়। একেবারে পায়খানা-প্রস্রাব করাটাও শিখিয়ে দেয়! তখন সালমান (রা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ তিনি আমাদের সবকিছু শিখিয়েছেন। এরপর সেই লোকের কাছে তিনি এতদ্বসংশ্লিষ্ট ইসলামের বিধানাবলি বর্ণনা করেন। (মুসলিম : ২৬২)

ইহকাল ও পরকাল :

প্রাচীন মিসরীয়রা মানুষের মৃত্যুর পরে মৃতদেহ মমি করতো এবং সেই মমির সঙ্গে পৃথিবীতে তার রেখে যাওয়া মূল্যবান সহায়-সম্পত্তি দাফন করে দিতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, পরকালে ওগুলো তার দরকার হবে।

অপরদিকে তিব্বতের অনেক সম্প্রদায় কারও মৃত্যুর পরে মৃতদেহ কুচিকুচি করে কেটে উঁচু কোনো স্থানে ভয়ংকর ও হিংস্র পাখির খাবার হিসেবে রেখে দিতো। হিন্দুরা আজও তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করে। কেননা তাদের বিশ্বাস, এগুলোই মানবাত্মার মুক্তির একমাত্র পদ্ধতি।

এগুলো মূলত অসংখ্য বিশ্বাস ও প্রথার দুয়েকটি ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় মৃতকে বিদায় ও তার দেহ সৎকারের অসংখ্য বিচিত্র প্রথা ও পদ্ধতি ছিল। ধর্মবিশ্বাস ছিল এই বৈচিত্র্যের মূল ভিত্তি। আর এখানেই আমাদের সামনে কিছু গভীর ও জটিল প্রশ্ন চলে আসে যেগুলোর জবাব প্রয়োজন। আসলেই কি আমাদের পার্থিব জীবনের পরে আরও একটি জীবন রয়েছে? থাকলে সে জীবন কেমন হবে? সেখানে ভালো থাকতে হলে আমাদের কী কী প্রয়োজন হবে?

কেননা মৃত্যু হলো এমন এক মহা বাস্তবতা গোটা মানব সভ্যতা যার সত্যতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। পৃথিবীর অনেক মানুষ পরকালে বিশ্বাস করে। অনেকে অদেখা সেই জগতে বিশ্বাস করে না। অনেকে সেই অনিবার্য মুহূর্তের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অনেকে পার্থিব জীবনের রঙরসে মজে থেকে সেটাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত্যু যে শাশ্বত বাস্তবতা, সে যে একদিন আসবেই– এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই।

এ কারণেই শত উদাসিনতা ও উন্নাসিকতার মাঝেও একটি প্রশ্ন মানুষকে নাড়া দিয়ে যায়। মানুষ যখন একাকীত্বের মাঝে একটুখানি নিজের আত্মার সঙ্গে কথা বলে, তখনই সেই অবিনশ্বর প্রশ্ন সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় : মৃত্যুই কি আসলে সবকিছুর উপসংহার? এরপর কি কিছুই নেই? তাহলে আমাদের এই জীবন কি নিতান্তই অর্থহীন?

প্রশ্নটি বারবারই আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। সে কারণে পবিত্র কুরআনও এমন প্রশ্ন আমাদের বারবার ও বিভিন্নভাবে করে। পাশাপাশি কুরআন আমাদের এমন অনেক ব্যক্তির ঘটনা বলে, যারা পরকালে মহাবিচারের দিন চরম দুঃখ ও পরিতাপে নিপতিত হবে। কারণ তারা কোনোদিন এই প্রশ্নের জবাব খোঁজেনি। মৃত্যুর পর অপেক্ষমাণ এক মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়নি। সেদিন তাদের কেউ বলবে, হায় যদি এ জীবনের জন্য আমি কিছু করতাম! প্রচণ্ড মনস্তাপে আবার কেউ বলবে, হায় যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (ফাজর : ২৪; নাবা : ৪০)

উল্লেখ্য, সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীরা পরকাল ও সেখানে বিদ্যমান শান্তি ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করে। কেননা এই বিশ্বাসই মূলত সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মর্মকথা। মানুষের সুস্থ বিবেকও সাক্ষ্য দেয় যে, পরকালে একটি জীবন আছে, যেখানে মানুষের ইহকালের হিসাব নেয়া হবে, ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে- এমন বিশ্বাস ছাড়া এ জীবনের কোনো অর্থ নেই। দীন ও ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই।

এতদ্বসত্ত্বেও কিছু কিছু লোক মনে করে, ধর্ম ও ইবাদত-বন্দেগী মানুষের ইহকালীন জীবনের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও উপভোগের পথে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং ইহকাল বা পরকাল, দুনিয়া বা আখেরাত- দু'টোর যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। যেকোনো একটার পেছনে সময় দিতে হবে। দিন ও রাত যেমন এক হওয়া অসম্ভব, ইহকাল ও পরকালের জন্য একসঙ্গে কাজ করাও অসম্ভব!

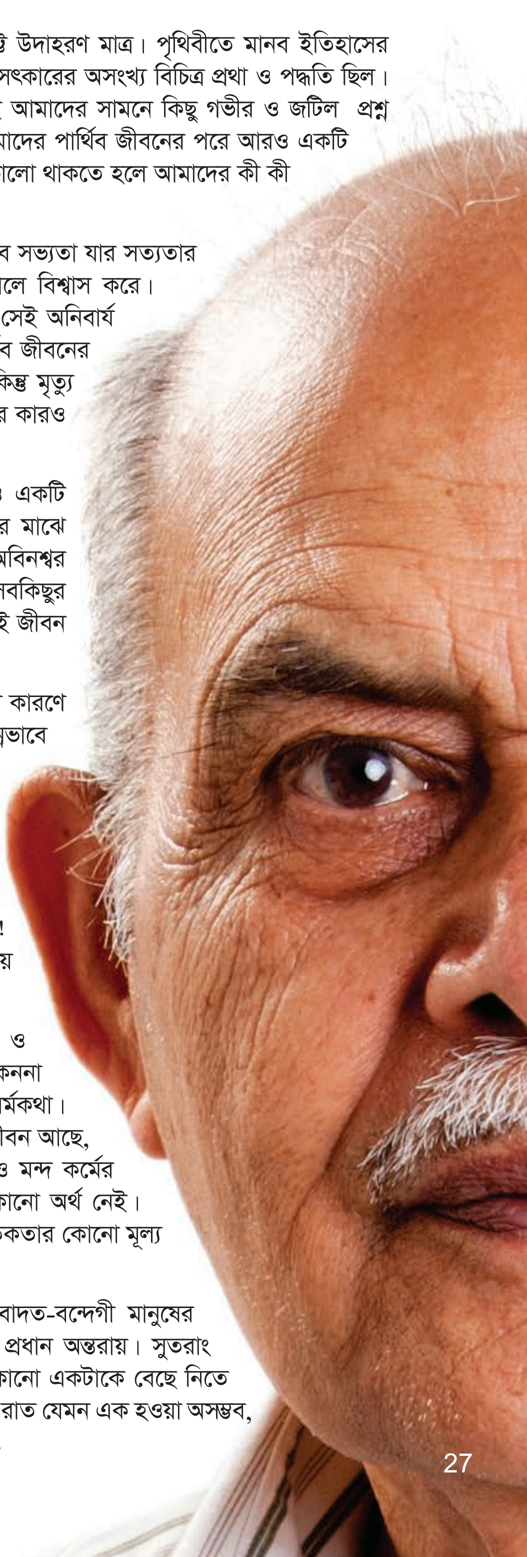

এসব মানুষের বিস্ময়ের কোনো কূল-কিনারা নেই। উপরন্তু তাদের অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, ইসলামে উপাসনা আর উপভোগের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই। আখেরাত আর দৌলত দু'টোর মাঝে সংঘর্ষ নেই। আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের জানিয়ে গেছেন, যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে কোনো ভালো কাজ করবে, সেটা যে ধরনের কাজ হোক না কেন, আখেরাতে সেটার বিনিময় পাবে।

> জগতের সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীরা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে, সে জীবনে বিদ্যমান পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস রাখে।

যার ফলে যদি কেউ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো বস্তু সরিয়ে ফেলে, কিংবা নিজের স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দেয়, পরকালে এরও সে প্রতিদান লাভ করবে। (বুখারী : ৫৬)

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন এই ব্যাপারটিই স্বীয় সাহাবীদের বুঝাতে চাইলেন, তখন তিনি একটি কৌতূহলীদ্দপক উদাহরণ পেশ করলেন। তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্ভোগ করে, এর বিনিময়েও সওয়াব (পুণ্য) লাভ করবে। তখন সাহাবীগণ বললেন, যৌন সম্ভোগের সঙ্গে সওয়াবের কী সম্পর্ক? আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি কেউ স্ত্রী ব্যতীত অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করে সেটার দ্বারা কি পাপ হবে না? তারা বললেন জী, পাপ হবে। তিনি বললেন, সে কারণেই বৈধ পন্থায় করলে পুণ্য হবে। (মুসলিম : ১০০৬)

একারণেই যদি কেউ গভীরভাবে ইসলামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাহলে শুরু থেকেই পবিত্র কুরআনে চিত্রায়িত ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক অনুপম ভারসাম্য দেখে মুগ্ধ হবে। আর তাই আমরা যখন দেখি কুরআন মানুষকে পরকালে পুণ্য লাভের আশায় উপাসনায় উৎসাহিত করে, একই সময়ে পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা-সাধনার প্রতি আহ্বান করে (জুমুআ : ৯-১০)। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব জীবনের কোনো কাজ করলেও সে পুণ্য লাভ করবে। একজন মুসলিম যেভাবে নামাজ-রোজা, দান-সদকার মাধ্যমে আল্লাহর উপাসনা করে, ঠিক তেমনিভাবে নিজের চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তান প্রতিপালন, নিজের শরীর ও পরিবেশের প্রতি গুরুত্বদান এবং সর্বোপরি সমাজের উন্নয়নের মাধ্যমেও আল্লাহর উপাসনা করতে পারে।

যখন একজন মুসলিম তার ইহকাল আর পরকালের মাঝের এই সুনিবিড় সংযোগ, উপভোগ আর উপাসনার মাঝের এই অপূর্ব ঐকতান অনুভব করে, যখন দেখে যে এগুলোর ভেতরে কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ নেই। রয়েছে একে অপরের পরিপূরকতা। তখনই সে জীবনের প্রকৃত ও আত্মিক প্রশান্তি পায়। ভেতরের জগতটা স্বর্গীয় সুখে গমগম করে।

> কুরআন সবসময় ভারসাম্যের প্রতি আহ্বান করে। একদিকে যেমন পরকালে পুণ্য লাভের আশায় উপাসনার প্রতি উৎসাহিত করে, একই সময়ে পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা-সাধনার প্রতি আহ্বান করে।

দুনিয়া ও আখিরাত, ইহকাল ও পরকালের বর্ণিল এই মিলনই ইসলামের প্রকৃত দীক্ষা। আর তাই কুরআন একজন মুসলিমকে এই দীক্ষারই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এভাবে : নিশ্চয়ই আমার পুরো জীবনটাই আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিবেদিত। কেবল আমার নামাজ ও ইবাদতই আল্লাহর জন্য নয়; বরং আমার জীবনের সবকিছুই তাঁর জন্য। তিনি আমার কাজের হিসাব নিবেন এবং মৃত্যুর পরে বদলা দেবেন। আর এভাবেই আমি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবো। ইসলামের ওপর অবিচল থাকবো।

যোগাযোগ ও সহযোগিতার ধর্ম :

রাশিয়া, ডেনমার্কসহ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যযুগের ইতিহাস পড়তে গেলে সবার আগে যে নামটি মানসপটে ভেসে ওঠে তিনি হলেন বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক আহমদ ইবনে ফাজলান। তার চুলচেরা বর্ণনাতেই এসব দেশের তৎকালীন মানুষের জীবনকথা ও সমাজের চিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে সেটা অন্য কারও লেখাতে ফুটে উঠেনি।

আহমদ ইবনে ফাজলান তার বিস্ময়জাগানিয়া ভ্রমণটি শুরু করেছিলেন ৯২১ সালে। অথচ আজও সেই ভ্রমণটি মধ্যযুগের সভ্যতার সংযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

ভ্রমণ হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। তিনি তৎকালীন জ্ঞান ও সভ্যতার রাজধানী বাগদাদ থেকে সফরটি শুরু করেছিলেন। এরপর দেশের পর দেশ, ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড চষে বেড়াতে থাকেন। নিজ চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে সূক্ষ্মভাবে মলাটবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে এক সময় সেটা একটা বিশাল গ্রন্থে পরিণত হয়। রাশিয়ায় প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে ১৩২৩ সালে গ্রন্থটি প্রথমবারের মতো সূর্যের আলো দেখার সুযোগ পায়।

একজন মুসলিম হওয়ার সত্ত্বেও ইবনে ফাজলানের হাতে রচিত খ্রিস্টানদের ইতিহাসের এত মূল্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রখ্যাত আমেরিকান স্কলার মাইকেল ক্রিকটন। তিনি বলেন, তৎকালীন সময়ে বাগদাদের মুসলমানরা প্রচণ্ড ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মানুষদের প্রতি বেশ উদার ছিল। মুসলমানরা ছিল তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে কম আঞ্চলিকতাবাদী জাতি। আর এ কারণেই অন্যদের ব্যাপারে তারা ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।

Michael Crichton (Eaters of the Dead)

ইসলাম মুসলিমদেরকে সমাজ ও সভ্যতার বিনির্মাণ এবং সংস্কারের কাজে অংশ নিতে বলে। ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে সর্বোচ্চ চরিত্র ও সদাচারের সঙ্গে মিশতে আহ্বান করে। অপরদিকে সমাজ ও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে নিষেধ করে এবং বলে যে সেটা প্রকৃত ইসলামের দীক্ষা নয়। আর একারণেই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মেশে, তাদের কষ্ট ও পেরেশানী সহ্য করে, তাকে জনবিচ্ছিন্ন ও ঘরকুনো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম বলেছেন। (ইবনে মাজাহ : ৪০৩২)

স্রষ্টা একজন.... উপাস্য একজন

ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বলেছে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসই কারও মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি কেউ আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে, তবে তাকে একক ইলাহ ও উপাস্য বলেও স্বীকার করতে হবে এবং মানতে হবে।

আরবী ভাষায় 'আল্লাহ' শব্দটি তিনটি সম্মিলিত অর্থ বহন করে :

- মাবূদ তথা উপাস্য। মানুষ কেবল তাঁর জন্য নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে। তাদের সার্বিক উপাসনা সর্বান্তকরণে তাঁরই জন্য নিবেদিত থাকে।
- সুমহান, গুণময় ও মহামহিম সত্তা। যার বড়ত্ব ও মহিমার পরিমাণ নিরূপণে মনুষ্য বিবেক অপারগ, অক্ষম ও অসহায়।
- আপনজন। হৃদয় যার প্রতি অনুরক্ত। দিল যার জন্য বেকারার। যার স্মরণ, সান্নিধ্য ও আরাধনায় আত্মার প্রশান্তি লুক্কায়িত।

পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারটির ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে যে 'আল্লাহ' সম্পর্কে মানুষের ধারণা যেন হয় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক সব ধরনের বিকৃতির কালিমা থেকে মুক্ত।

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা হলেন গোটা বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও রূপকার। এ বিশ্বে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সবকিছুও তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন, তাঁর জ্ঞান ও নির্ণয়ের ফলাফল। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে সৃষ্টিজীবের কোনো নারীলিঙ্গ গর্ভধারণ করে না। তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও অনুগ্রহের বাইরে এ পৃথিবীতে এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে না। পৃথিবীর কোথাও প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে, রাতে কিংবা দিনে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটে না। (ফুসসিলাত : ৪৭; আনআম : ৫৯)

তিনি সর্বাধিক সুন্দর, পরিপূর্ণ ও অনিন্দ্য গুণাবলির অধিকারী। তিনি মহাশক্তিমান, অপরাজেয়, অনভিবনীয়। তিনি পরম দয়ালু। তাঁর দয়া জগত-বিস্তৃত। তিনি মহা-মহীয়ান। সব-ধরনের অপূর্ণাঙ্গতার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।

পৃথিবীর কিছু মানুষের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছে, 'আমি আকাশ ও মাটি এবং এতদুভয়ের মাঝের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। আর আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (ক্বফ : ৩৮) বস্তুত আল্লাহ সম্পর্কিত এধরনের ভয়ংকর কল্পনা একজন মানুষের মনে তখনই আসে, যখন সে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির

কুরআন সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আল্লাহ তাআলা হলেন সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময়। এমনকি বৃষ্টির ফোঁটা এবং রাতের আঁধারে ঝরে যাওয়া গাছের পত্র-পল্লব সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত।

> ইসলামের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিধানাবলীর ভেতরে সর্বাগ্রে রয়েছে এক আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা এবং সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা। কুরআনের ভাষ্যমতে, এটাই ছিল জগতের সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মর্মকথা।

মতো মনে করে। আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত এ নিখিল বিশ্বের সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি কীভাবে স্রষ্টার মতো হয়? ('তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা') (শূরা : ১১)

তিনি মহান সুবিচারক ও পরম ইনসাফগার। তিনি কাউকে বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না। খোলা চোখে অনেক কিছু মানুষের কাছে অযাচিত মনে হলেও তাতে অন্তর্নিহিত রয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহ। চিন্তাশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির বিস্তর ফারাক হেতু বাবা-মায়ের অনেক সিদ্ধান্তের মর্মই একটা ছোট্ট শিশুর বোধগম্য ও মনোঃপুত হয় না। একইভাবে আল্লাহর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত ও কাজের রহস্যও মনুষ্য বিবেক পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম না।

কিন্তু এসব কেবল বিশ্বাসের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখার নামই 'ঈমান' নয়। আল্লাহকে যদি একক স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তখন তাকে একক উপাস্য হিসেবেও মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও উপাসনা করা যাবে না। কারও কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা যাবে না। সব ধরনের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর উপাসনা করতে হবে। কেননা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এসব কিছু থেকে পবিত্র।

পৃথিবীর কোনো রাজা-বাদশা তাঁর উজির-নাজির, পাত্র-মিত্র ও দরবারের লোকজনের সহযোগিতা ব্যতীত রাজ্যের অসহায় ও দুঃস্থ প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না। তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান। গোটা বিশ্বজগত তাঁর হাতে ও তাঁর ক্ষমতার অধীনে। তিনি যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন 'কুন' (হও), আর তখন তা হয়ে যায়।... তাহলে এই মহাপরাক্রমশালী উপাস্য বাদ দিয়ে অন্য কারও উপাসনা করার যুক্তি কী!

কুরআন আমাদের জানাচ্ছে, মানুষের হৃদয়ের স্থিরতা ও আত্মার প্রশান্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে না, যতক্ষণ না সে তনুমনে সর্বান্তকরণে তার প্রভুর কাছে শরণ নেয়। তাঁর কাছে সকল প্রয়োজন ও প্রার্থনা অর্পণ করে। কারণ তিনি মহাশক্তিমান, মহা-মহীয়ান। তিনি তাঁর বান্দাদের ভালোবাসেন। অনুগ্রহ করেন। তিনি তাদের নিকটেই থাকেন। বান্দার প্রার্থনায় তিনি সন্তুষ্ট হন। মানুষ যত তাঁর কাছে যায়, তাঁর সমীপে অবনত হয়, তিনি ততই তার মর্যাদা সমুন্নত ও বুলন্দ করেন। বিনিময় দান করেন। (বাক্বারা : ২৮, নামল : ৬২-৬৩)

একারণেই ইসলামের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিধানাবলির ভেতরে সর্বাগ্রে রয়েছে এক আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা এবং সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা। (নাহল: ৩৬) কুরআনের ভাষ্যমতে, এটাই ছিল জগতের সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মর্মকথা। সে কারণে নবী-রাসূল, রাজা-বাদশাহ, বুযুর্গ-দরবেশ কারও উপাসনা করা যাবে না। কাউকেই আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানানো যাবে না। কারণ দিন শেষে তারা সকলেই মানুষ ও আল্লাহর দাস। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের অতি নিকটে। যখনই তারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডাকে, তিনি তাদের কথা শ্রবণ করেন। তাদের ডাকে সাড়া দান করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহমুখী হয়, সে প্রকৃত সৌভাগ্য ও সান্নিধ্যের সুখ-স্বাদ লাভে ধন্য হয়। অস্থিরতা ও উদ্বেগ তাকে স্পর্শ করে না। সবকিছুর মালিক একজন। সৃষ্টিকর্তা একজন। উপাস্য একজন। সুতরাং সেই একজনের জন্যই সকল আরাধনা-উপাসনা হবে। কেবল তাঁর কাছেই সবাই শরণ নেবে।

এটাই পবিত্র কুরআনের ছোট্ট অথচ বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ সূরা ইখলাসের মর্মকথা।

সূরা ইখলাস

এ সূরাতে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর নবীকে ‘আল্লাহ কে?’ এমন প্রশ্নের উত্তর ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন।

- আল্লাহ এক। উপাসনার একমাত্র অধিকারী।
- আল্লাহ- যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগত নির্ভরশীল। সকলেই নিজস্ব প্রয়োজনে যার কাছে ছুটে যায়।
- তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। কারণ তিনিই প্রথম। তাঁর আগে কিছুই নেই।
- তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে তিনি অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ ও সদৃশ আর কেউ নেই। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। বাকি সবকিছু সৃষ্টি।

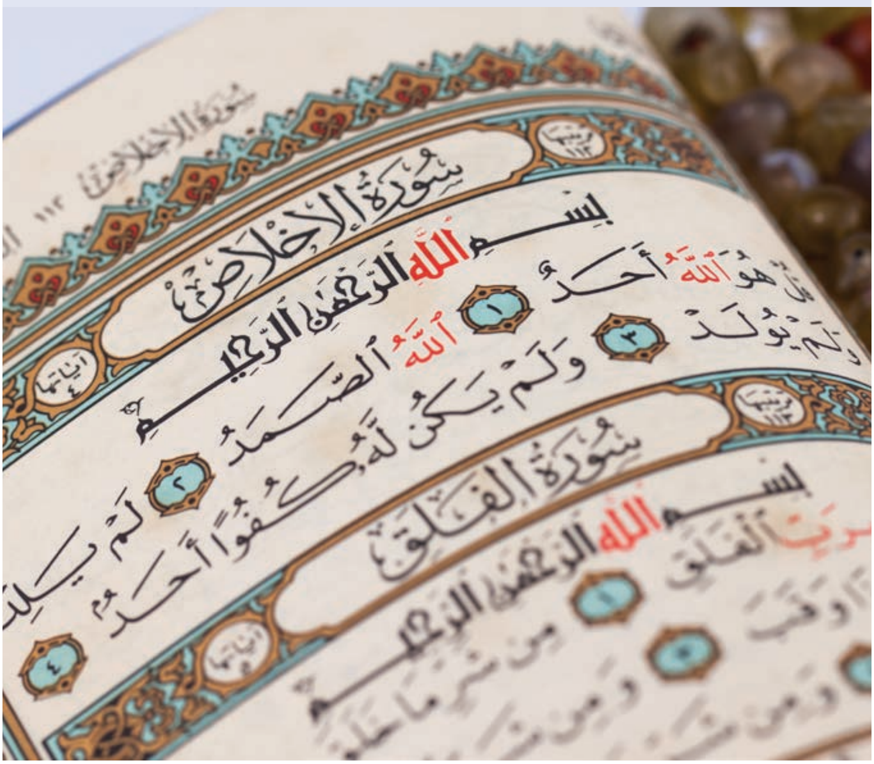

প্রকৃতির আইন ও শরীয়তের আইন :

মানব শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষ থেকে শুরু করে সুদূর মহাকাশের গ্যালাক্সি পর্যন্ত- যা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না- এ বিশাল মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু আল্লাহ তাআলা অভাবনীয় সূক্ষ্মতা, অসীম নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর সিস্টেম ও শৃঙ্খলা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। যে শৃঙ্খলা ছাড়া এখানে কোনো জীবন কিংবা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। বিশ্বের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা একমত যে, মহাবিশ্বে বিদ্যমান শৃঙ্খলা যদি একচুল পরিমাণ এদিক-সেদিক হয়, তবে সেটার অনিবার্য পরিণতি হবে ধ্বংস ও মহাপ্রলয়।

একজন মুসলিম বিশ্বাস করে, যেই স্রষ্টা পৃথিবীর জন্য এমন বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ও আইন তৈরি করেছেন, পৃথিবীতে মানব জীবনের শৃঙ্খলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আইন ও ব্যবস্থাপনা কী হবে সেটা তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। আর সে কারণে কেবল তাঁর মনোনীত ধর্মই হতে পারে গোটা মানব জীবনের একমাত্র সংবিধান, একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। সকল বাড়াবাড়ি ও ভারসাম্যহীনতা থেকে মুক্তির চাবিকাঠি।... কুরআনেও আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যিনি পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের কল্যাণ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। (সাবধান! তিনি জানেন তিনি যা সৃষ্টি করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (মুলক : ১৪)

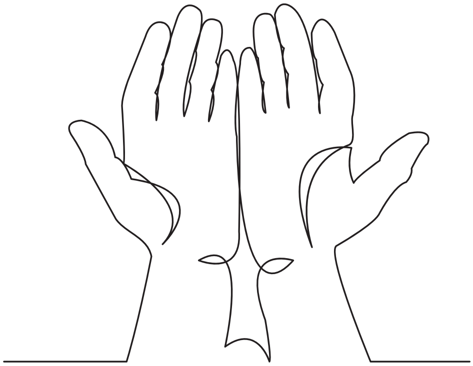

ইসলামে পুরোহিততন্ত্রের স্থান নেই

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম কিছু মানুষকে অন্য সব মানুষের ওপর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সবার বিশ্বাস ও উপাসনা-আরাধনাকে সেই বিশেষ কিছু মানুষের সন্তুষ্টি ও অনুমোদনের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। যার ফলে সেসব ধর্মে সেই মানুষগুলো আল্লাহ আর মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্য দিয়েই মানুষকে তার প্রভুর কাছে যেতে হবে। তারা মানুষের পাপ পোচন করে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, তারা অদৃশ্যের সংবাদও জানে। আর তাদের বিরুদ্ধাচারণের পরিণতি হচ্ছে মহাসর্বনাশ।

এর বিপরীতে ইসলামে ‘ধর্মের লোক’ তথা পুরোহিত বা যাজক বলতে আদৌ কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক দাসত্ব ও বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছেন। ফলে কেউ তার ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী হবে না। যত বড়ই পীর-বুযুর্গ কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি হোন- মানুষের সৌভাগ্য, উপাসনা-আরাধনা, অপরাধ-মার্জনার ক্ষমতা ইসলাম কোনো মানুষের কাছে সঁপেনি।

তেমনি ইসলাম মানুষকে সব ধরনের জ্ঞানগত দাসত্ব থেকেও মুক্ত করেছে। ইসলামে জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী বলতে কোনো গোষ্ঠী নেই। ফলে ধর্মের জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনকে অনুধাবন কেবল সকল মানুষের অধিকার বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সকলের অবধারিত দায়িত্ব বলে দিয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া, অনুধাবন করা ও কুরআনের মর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং সর্বোপরি সেটা জীবনে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। (সোয়াদ : ২৯)

> “ইসলাম মানুষকে সম্মানিত করেছে এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করেছে। তাকে সব ধরনের আধ্যাত্মিক দাসত্ব ও বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছে। ফলে কেউ তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী হবে না। যত বড়ই পীর-বুযুর্গ কিংবা সম্মানিত ব্যক্তি হোন- মানুষের সৌভাগ্য, উপাসনা-আরাধনা, অপরাধ-মার্জনার ক্ষমতা ইসলাম কোনো মানুষের হাতে সঁপেনি।

সুতরাং ঈমান ও ইবাদত এগুলো মানুষ ও তার প্রতিপালকের মাঝের একান্ত ব্যাপার। এখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতা কিংবা অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অতি সন্নিকটে। তিনি তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোনেন। তাদের তাদের ডাকে সাড়া দেন। তাদের উপাসনা-আরাধনা প্রত্যক্ষ করেন এবং সেগুলোর প্রতিদান দেন। পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের পাপ ক্ষমা ও অপরাধ মার্জনার ক্ষমতা নেই। বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী হয়, নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মানুষ যেখানেই যাক, যখনই ডাকুক- আল্লাহ তাদের কাছেই আছেন। কুরআনে তিনি বলছেন, 'আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমি অতি সন্নিকটে। যখন আমাকে কেউ ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় আর আমাকে বিশ্বাস করে। তাহলে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। (বাকারা : ১৮৬)

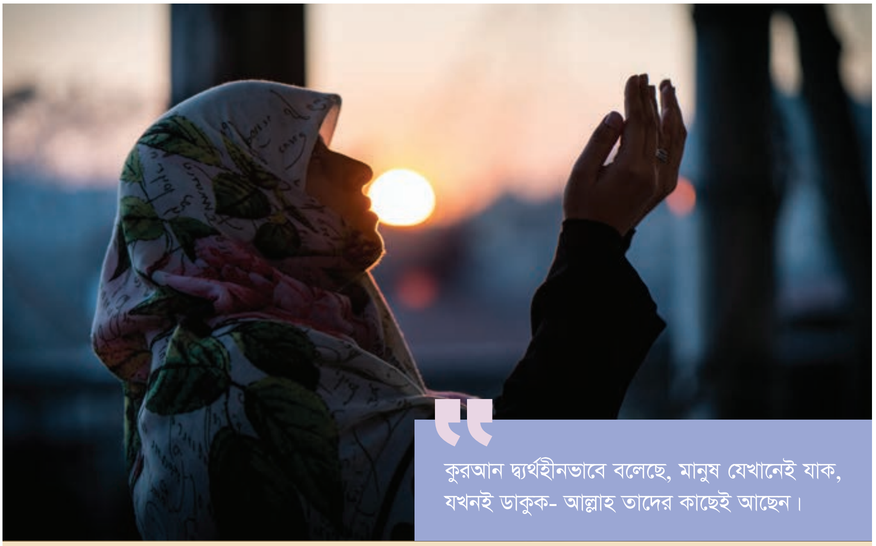

ইসলামে প্রবেশের কি বিশেষ আচার রয়েছে?

ইসলাম সম্পর্কে কারও মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালে সে খুব সহজেই তাতে প্রবেশ করতে পারে। এক্ষেত্রে জটিল কেনো আচার-প্রথা নেই। বিশেষ কোনো স্থান কিংবা বিশেষ কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিরও প্রয়োজন নেই। ইসলামের দু'টি সাক্ষ্য রয়েছে (শাহাদাত), সেগুলোর মর্ম জেনে, অনুসরণের নিয়তে, বিশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট। সাক্ষ্যদু'টি হচ্ছে :

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই (অন্য কথায়, আমি বিশ্বাস করি ও সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। সুতরাং আমি কেবল তাঁরই উপাসনা করবো। তাঁর সঙ্গে আর কাউকে অংশীদার করবো না।)

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল (অন্য কথায়, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত (রাসূল)। সুতরাং আমি তাঁর নির্দেশগুলো মেনে চলবো। তাঁর নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকবো। তাঁর দেখানো পথে আমি আল্লাহর উপাসনা করবো)

রাসূল আসলে কারা?

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য। অতঃপর যুগে যুগে তাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর বিধি-বিধান শিক্ষা দেন। আল্লাহর ধর্মের কথা মনে করিয়ে দেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সংশোধন-সংস্কারের কাজ করেন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বগোত্রের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তারা বিকৃতি ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন। মানুষকে সঠিক ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করতেন। যাতে করে এরপর আর কারও আল্লাহতে অবিশ্বাস করার সুযোগ না থাকে। ইসলামের পরিভাষায় তাদের বলা হয় রাসূল। কিন্তু তাদের প্রকৃত পরিচয় কী?

এবার আমরা সেগুলো জানবো :

রাসূলগণ ছিলেন মানুষ

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকল রাসূলদের মানুষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে ওহী (প্রত্যাদেশ) ও রিসালত (পয়গাম) পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা আমাদের সমস্তরের মানুষ ছিলেন। তারা মানবীয় স্বচ্ছতা, নির্মলতা ও অবিচলতার শীর্ষে ছিলেন। কারণ আল্লাহ তাদেরকে নিজের দীন ও পয়গাম বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। কুরআনে এসেছে, '(হে নবী) আপনি বলুন! আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে ওহী আসে।' (কাহাফ : ১১০)

সুতরাং বোঝা গেলো সকল রাসূল মানুষ ছিলেন। মানুষের মতোই তারা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। মানুষের মতোই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তারা অসুস্থ হতেন। দেহ ও শরীর, আকৃতি ও অবয়ব, জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা– সকল দিক থেকে তারা মানুষের মতোই ছিলেন।

তাদের ভেতরে উপাস্য হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু তাদের নিকট ওহী আসতো। আল্লাহ তাদের নিকট ফিরিশতা কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে আসমানী পয়গাম পাঠাতেন।

প্রাচীনকালের মানুষগুলো ওহীর কথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হতো। তারা মনে করতো এটা আবার কী জিনিস। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উল্টো তাদের বিস্ময়কে নাকচ করে দিয়েছেন এবং এটাকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। কারণ আল্লাহর বিধি-বিধান মানুষের কাছে আসার জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। (ইউনুস : ২)

রাসূলদের মর্যাদার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট তাঁর পয়গাম পৌঁছানোর জন্য সৃষ্টিজগতের ভেতর থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের বাছাই করেছেন। এ কারণে রাসূলগণ ছিলেন সততা, বিশুদ্ধতা, ঋজুতা ও নির্মলতার চূড়ায়। সকল রাসূলের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, তারা সকলে ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত, সৎকর্মশীল, নেককার, বাছাইকৃত ও গোটা জগতবাসীর ভেতরে শ্রেষ্ঠ। (আনআম : ৮৪-৮৭)

> কুরআনের অসংখ্য আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকল রাসূলদের মানুষ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

রাসূলগণ মানবীয় ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নন। তবে পার্থক্য হলো তারা ভুলের ওপর অব্যাহত থাকেন না। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ তাদের সতর্ক করে দেন এবং তারা তওবা করে বিমল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যান। তবে এই যে ভুল-ভ্রান্তি সেটাও কিন্তু অনিচ্ছাকৃত। হয়তো তারা সঠিক মনে করে করেছেন তথাপি পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিধানের সীমালঙ্ঘন– সেটা রাসূলদের দ্বারা কখনোই সংঘটিত হয়নি।

এভাবে কুরআন আমাদেরকে নবী-রাসূলদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র উপহার দিয়েছে। এ চিত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি নেই। নবী-রাসূলগণ নিষ্কলুষ ও পাপমুক্ত। কিন্তু তারা মানুষ; খোদা নন। খোদার পুত্রও নন। কোনো দিক দিয়েই তারা উপাস্য কিংবা প্রতিপালক নন।

আমাদের এ বক্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনে কারীমেই পাচ্ছি। কুরআন আমাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঈসা (আ.) এর মাঝের একটি কথোপকথন তুলে ধরেছে। যেখানে দেখতে পাই আজকের খ্রিস্টান কর্তৃক ঈসা (আ.) এর খোদায় পরিণত হওয়ার দায়ভার ঈসা (আ.) এর ওপর নয়; বরং তাঁর অনুসারীদের ওপর : 'আর যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি মানুষকে বলেছো যে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো? তখন ঈসা (আ.) বলবেন, আপনি মহা পবিত্র! আমার এমন কথা বলার কোনো অধিকার নেই। এমন কথা যদি আমি বলে থাকি তবে তো আপনি নিশ্চয়ই

জেনে থাকবেন। আমার অন্তরের কথা আপনি ভালো জানেন। কিন্তু আমি জানি না আপনার ভেতরের কথা। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সার্বিক অবগত। আমি তো তাদের কেবল তা-ই বলেছি যা আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। এরপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যুদান করলেন, আপনিই ছিলেন তাদের একমাত্র পর্যবেক্ষক। আর আপনি সবকিছুর ওপর সাক্ষী।' (মায়েদা : ১১৬-১১৭)

কেউ কুরআনে কারীমের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখবে, কুরআনের বেশকিছু সূরা নবী-রাসূলদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যথা: ইবরাহীম, ইউসুফ ইত্যাদি। উপরন্তু ঈসা (আ.) এর জননী- মারইয়াম (আ.) এর নামেও কুরআনে একটি সূরা রয়েছে।

রাসূলদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক মানুষের ধারণা, কুরআন বুঝি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা বিস্ময়ে খেই হারিয়ে ফেলে, যখন জানতে পারে যে ঈসা (আ.) এর মর্যাদা বর্ণনায় ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনে কুরআনে ২৫ বার তাঁর নাম এসেছে। মূসা (আ.) এর নাম এসেছে ১৩৬ বার। অথচ যাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর নাম কুরআনে এসেছে মাত্র ৫ বার।

আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকে জানে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যদের নবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ লালন করে। অথচ কেউ কুরআন পড়লে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সুপষ্টভাবে লেখা দেখবে যে, সকল নবী-রাসূলে বিশ্বাস করার আগ পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না। যদি নবী-রাসূলের মধ্য থেকে কাউকে অস্বীকার করে কিংবা কারও রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, অথবা কাউকে মিথ্যা অভিযোগে দোষী করে, তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। কুরআন ঘোষণা করেছে, রাসূল (সা.) এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সবকিছুতে বিশ্বাস করে। এ কারণে তারা আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল রাসূলে বিশ্বাস করে। ঈমানের ক্ষেত্রে কারও মাঝে কেনো বৈষম্য করে না। (বাকারা : ২৮৫)

কেউ কুরআনে কারীমের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখবে, কুরআনের বেশকিছু সূরা নবী-রাসূলদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যথা: ইবরাহীম, ইউসুফ ইত্যাদি। উপরন্তু ঈসা (আ.) এর জননী-মারইয়াম (আ.) এর নামেও কুরআনে একটি সূরা রয়েছে।

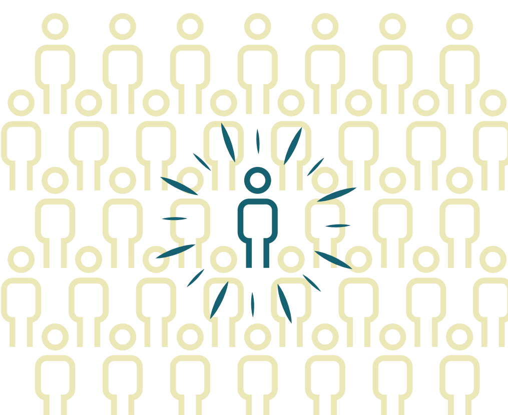

ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ঈসা

পৃথিবীর ইতিহাসের একজন মহামানব হলেন ঈসা (আ.)। বিশ্ব মানবেতিহাসে যারা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেছেন, তিনি তাদের প্রথম সারিতে। কিন্তু একেবারে গোড়া থেকেই মানুষ তাঁর ব্যাপারে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়েছে। অপরদল তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন ও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের পাহাড় দাঁড় করেছেন। প্রশ্ন হলো তাহলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী তাঁর ব্যাপারে?

Holy
Bible

১. ঈসা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলদের একজন :

কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে, ঈসা (আ.) একজন শ্রেষ্ঠ ও মহামর্যাদাবান রাসূল। তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.) ছিলেন সত্যবাদিনী, সৎকর্মশীলা, আল্লাহর উপসনাকারিনী, সচ্চরিত্রা, সতীসাধ্বী কুলনারী ও কুমারী। আল্লাহর কুদরতে পিতাবিহীনভাবে ঈসা (আ.) কে গর্ভধারণ করেছেন তিনি। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে মুজিযাস্বরূপ পিতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা-মাতা উভয়কে ছাড়া। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'ঈসা (আ.) আল্লাহর জীবন্ত সৃষ্টির কারিশমা। আল্লাহ যেমন আদমকে পিতা-মাতা উভয়কে ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে ঈসা (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ছাড়া। তিনি যখন কোনো কিছুতে 'কুন' বলেন, তখন সেটা হয়ে যায়। (নিশ্চয়ই ঈসার উদাহরণ আল্লাহর কাছে আদম এর মতো। আল্লাহ তাআলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন হয়ে যাও। তখন সে হয়ে গেছে।' আলে ইমরান : ৫৯)

২. প্রত্যেক মুসলিম তাঁর মুজিযাতে বিশ্বাস করে

ঈসা (আ.) কুষ্ঠরোগী ও অন্ধকে ভালো করতে পারতেন। মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। মানুষ নিজের ঘরের ভেতরে কী খেয়েছে এবং কী রেখে এসেছে সেটাও বলে দিতে পারতেন। এগুলো সবই করতেন আল্লাহর নির্দেশে। এগুলোকে বলা হয় মুজিযা বা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে প্রকাশ করেছেন। এগুলো মূলত তাঁর নবী ও রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল।

৩. আল্লাহ তাঁর ওপর পবিত্র গ্রন্থ ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন

কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানবতার পথ-প্রদর্শনের জন্য, আলোকবর্তিকা ও অনুগ্রহ স্বরূপ ঈসা (আ.) এর ওপর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর এ গ্রন্থ ঈসা (আ.) এর পরে নানা ধরনের বিকৃতির শিকার হয়। ইতিহাসের ধাপে ধাপে চলতে থাকে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ধারাবাহিকতা।

৪. তিনি মানুষ; উপাস্য নন

ইসলাম আমাদের জানিয়েছে, ঈসা (আ.) অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ও আদম সন্তান ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তাঁকে বনী ইসরাঈলের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর হাতে অসংখ্য মুজিযা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে প্রতিপালক কিংবা উপাস্য হওয়ার মতো কেনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, ঈসা কেবল একজন সৎকর্মশীল বান্দা ছিল। আমি তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেছি। তাঁকে অসংখ্য মুজিযা দান করেছি। যাতে করে এগুলো তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রমাণ এবং কল্যাণের পথের দিশারী হয়। 'সে তো কেবল একজন বান্দা (দাস) ছিল, আমি তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত করেছি।' (যুখরুফ : ৫৯)

৫. তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি; বরং আকাশে উত্তীর্ণ হয়েছেন

ইসলাম বিশ্বাস করে, ঈসা (আ.) কে হত্যা করা হয়নি কিংবা ক্রুশবিদ্ধও করা হয়নি; বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। যখন ঈসা (আ.) এর শত্রুরা তাকে হত্যা করতে মনোস্থ করলো, তখন আল্লাহ তাআলা আরেক লোককে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দিলেন। তারা সেই লোককে ঈসা ভেবে হত্যা করলো এবং ক্রুশে চড়ালো। অপরদিকে ঈসা (আ.) কে আল্লাহ জীবন্ত আকাশে তুলে নিলেন। এটাই কুরআনের বক্তব্য। (নিসা : ১৫৭-১৫৮)

নবীগণের তালিকা

আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মাঝে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন–

আদম :

গোটা মানব জাতির জনক। আল্লাহ তাআলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ফিরিশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়েছেন তাঁকে। এরপর জান্নাত থেকে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

নূহ :

স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছে। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তাদের তুফানের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়েছে। নূহ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীরা কিশতীর মাধ্যমে তুফান থেকে নিরাপদ ছিলেন।

ইবরাহীম :

নবীদের জনক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাসূলদের একজন। আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। মুসলমানদের কিবলা কাবা শরীফ তাঁর হাতেই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল।

ইসমাঈল :

ইবরাহীম (আ.) এর পুত্র। কাবা নির্মাণের সময় পিতাকে সহায়তা করেছেন।

ইসহাক :

ইবরাহীম (আ.) এর আরেক পুত্র। ফিরিশতাদের সুসংবাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ইয়াকুব :

ইসহাক (আ.) এর পুত্র। তাঁর আরেকটি নাম হলো ইসরাঈল। বনী ইসরাঈল জাতি তাঁর বংশোদ্ভূত।

ইউসুফ :

ইয়াকুব (আ.) এর পুত্র। জীবনে বেশকিছু বিপত্তি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পরে অবশেষে মিসরের শাসকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

মূসা :

শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের একজন। আল্লাহ তাআলা তাকে বনী ইসরাঈলের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর ওপর তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। বিভিন্ন মুজিযা দ্বারা তাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু (মিসর সম্রাট) ফিরআউন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তখন আল্লাহ তাআলা ফিরআউনকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা মুক্তি পান।

দাঊদ :

তিনি ছিলেন একাধারে নবী ও সুলতান। নিজ জাতির পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তিনি।

সুলাইমান :

দাঊদ (আ.) এর পুত্র। আল্লাহ তাআলা তাকে বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন। মানুষ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন সৃষ্টি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন।

যাকারিয়্যা :

বনু ইসরাঈলের নবীদের একজন। তিনি ছিলেন ঈসা (আ.) এর মাতা মারইয়াম এর অভিভাবক ও তার শিক্ষাদীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক। নিজের প্রচণ্ড বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবনের শেষ বয়সে একজন সন্তান দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর আরেক নবী ইয়াহইয়া।

ঈসা :

শ্রেষ্ঠতম রাসূলদের একজন। আল্লাহ তাআলা তাকে পিতাবিহীন কেবল মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। বনী ইসরাঈলের কাছে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর ওপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন। অসংখ্য মুজিযা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন।

মুহাম্মাদ :

পৃথিবীর সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে গোটা বিশ্বজগতের মানবমণ্ডলীর কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। পূর্ববর্তী সকল রাসূলের সত্যায়নকারী হিসেবে। তাঁর ওপর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যে গ্রন্থকে সামনে কিংবা পেছনে কোথাও থেকে মিথ্যা স্পর্শ করতে পারে না।

ইসলামের রাসূলের পরিচয়

মুহাম্মাদ

'মুহাম্মাদ' ইসলামের নবীর নাম..

এটা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃত একটি নাম। এ নামের অর্থ হলো: অধিক প্রশংসিত। চরিত্র ও কর্মের কারণে মানুষ যার প্রশংসা করে।

কে এই মুহাম্মদ? কী তার পরিচয়?

ইসলামের রাসূলের নাম

মুহাম্মাদ বিন (পিতা) আব্দুল্লাহ বিন (পিতা) আব্দুল মুত্তালিব বিন (পিতা) হাশেম কুরাইশী।

পৃথিবীতে তাঁর সময়কাল ছিল ৫৭০- ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর ব্যাপারে সকল মুসলমানের বিশ্বাস হলো–

তিনি গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত রাসূল :

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সা.) কে জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সকল মানুষের ওপর তাঁর অনুসরণকে আবশ্যক করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন বলছে, '(নবী) আপনি বলুন! হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক)। (আরাফ : ১৫৮)

তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে :

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ গ্রন্থের সামনে কিংবা পেছনে কোথাও থেকে মিথ্যা স্পর্শ করতে পারে না।

তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল :

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সা.) কে সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। কুরআন বলেছে, 'কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।' (আহযাব : ৪০)

ইসলামের রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. জন্ম :

মুহাম্মাদ (সা.) আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে মক্কা শহরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের আগেই তিনি পিতাকে হারান। শৈশবে মাতৃহারা হন। ফলে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন। দাদার মৃত্যুর পরে চাচা আবু তালিবের ছায়ায় বড় হন।

২. কৈশোর ও যৌবনকাল :

জন্ম থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত ৪০ বছর স্বীয় গোত্র কুরাইশের মাঝে বসবাস করেন। এসময়ে সবার মাঝে তিনি ছিলেন সচ্চরিত্র ও সদাচারণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সততা ও স্বাতন্ত্র্যের জীবন্ত উদাহরণ। সকলের মাঝে তিনি 'সত্যবাদী-বিশ্বস্ত' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে তিনি মেষ চরাতেন। পরে বাণিজ্য করেন।

ইসলামের আগে আল্লাহর রাসূল (সা.) 'হানীফ' ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) এর ধর্ম অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করতেন। সব ধরনের পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা থেকে তিনি ছিলেন যোজন-যোজন দূরে। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর– পড়তে কিংবা লিখতে পারতেন না।

৩. নবুওয়াত :

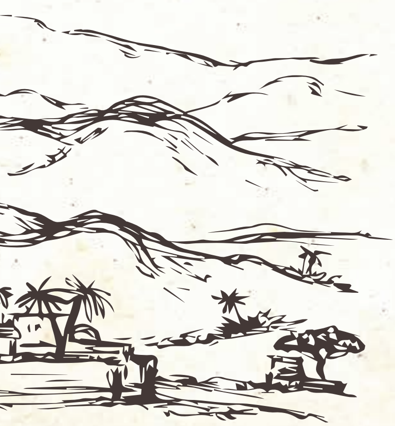

তাঁর জীবনের ৪০ টি বসন্ত শেষ হলো। এসময় তিনি মক্কার কাছে নূর পর্বতের 'হেরা' গুহায় চলে যেতেন এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। ঠিক তখন তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী (প্রত্যাদেশ) এলো। তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হলো। সর্বপ্রথম কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল : আল্লাহর নামে পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। (আলাক : ১) বস্তুত এই আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, এই ধর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও হিদায়াতের এক নতুন যুগ ও ধারার উদ্বোধন হয়েছে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ২৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. দাওয়াতের সূচনা :

আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রথমে তিন বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন। এরপর প্রকাশ্যে দশ বছর মক্কাতে দাওয়াত দেন। জগতের অন্যান্য নবীদের মতো তাঁর অনুসারীদেরও অধিকাংশই ছিলেন সমাজের দুর্বল, দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষ। এ সময় আল্লাহর রাসূল ও মুমিনরা কুরাইশদের হাতে প্রচণ্ড জুলুম, নিগ্রহ ও নিপীড়নের শিকার হন। তখন আল্লাহর রাসূল হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আগত বাইরের ও দূরের জাতিগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরতে লাগলেন। মদীনাবাসী আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন। এরপর মুসলমানরা ধীরে ধীরে হিজরত করে মদীনায় যেতে থাকে।

৫. হিজরত :

ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের নিপীড়ন ও হঠকারিতা দিনে দিনে বেড়ে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের কিছু নেতা মিলে নবীজী (সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তখন নবীজী (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনাতে হিজরত করে চলে যান। তখন মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব। নবীজী (সা.) এর বয়স ছিল ৫৩ বছর।

৬. ইসলাম প্রচার :

হিজরতের পরে নবীজী (সা.) ১০ বছর (৬২২-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) মদীনাতে জীবিত থাকেন। এ সময় তিনি ইসলামী সভ্যতার বুনিয়াদ স্থাপন করেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও জাত্যাভিমানের আগুন নিভিয়ে দেন। চতুর্দিকে জ্ঞানের আলো ছড়ান। ন্যায়, ইনসাফ, সততা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও শৃঙ্খলা-সুব্যবস্থাপনার ভিত্তি মজবুত করেন। এসময় আরবের অনেক সম্প্রদায় ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে ও অপপ্রচেষ্টা চালায়। সে কারণে মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর ধর্ম ও রাসূলের বিজয় দান করেন। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। মক্কাসহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ শহর ও নগর সন্তুষ্টচিত্তে এই বিশাল ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৭. মৃত্যু :

১১ হিজরী সনের সফর মাস। আল্লাহর রাসূল তাঁর পয়গাম পৌঁছানো সম্পন্ন করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত ধরে মানুষের ওপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলেন। দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। নবীজীও যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জ্বর হলো। ধীরে ধীরে প্রকোপ বেড়েই চললো। এক পর্যায়ে ১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস মোতাবেক (৬/৮/৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) সোমবার তিনি নশ্বর জগত ছেড়ে অবিনশ্বর জগতের পানে যাত্রা করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছরের বেশি। মসজিদে নববীর পাশে স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রা.) এর ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

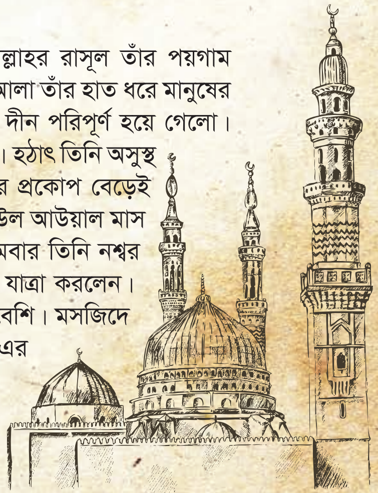

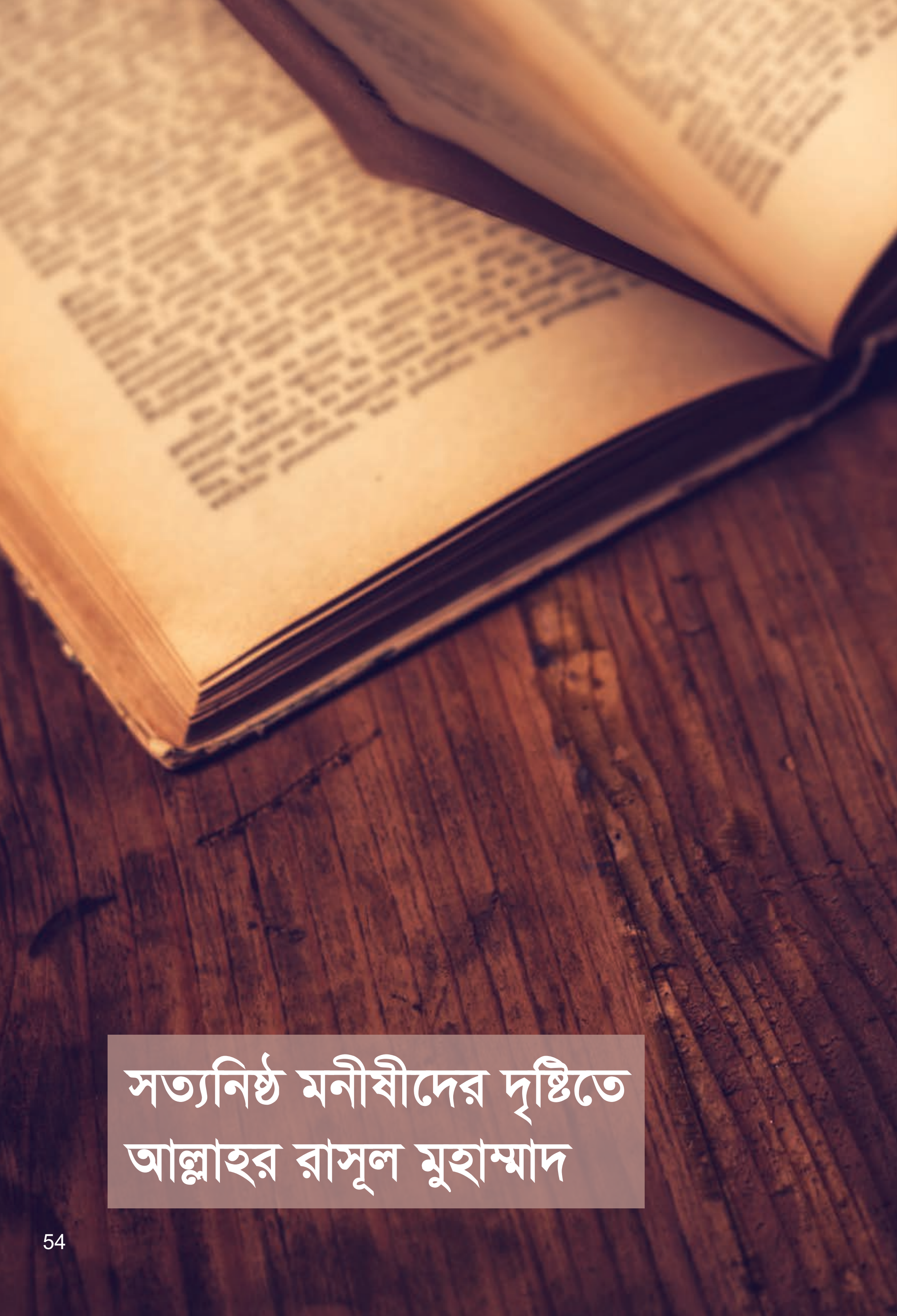

সত্যনিষ্ঠ মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ

জগতের

জগতের যেকেনো সংস্কৃতি কিংবা ধর্মের সত্যনিষ্ঠ ও নীতিবান মানুষ যদি ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রদীপ্ত জীবনীতে চোখ বুলায়, তবে বিস্ময়ে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। আর একারণেই আমরা দেখতে পাই, পাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য বড় বড় বিজ্ঞানী, মনীষী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক এব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের কলমে স্বীকার করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন−

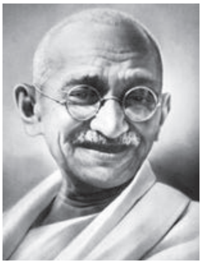

ভারতের বিখ্যাত নেতা মহাত্মা গান্ধী বলেন, কোটি কোটি মানুষের মনের মণিকোঠায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্বকারী মানুষটির জীবনে সম্পর্কে আমার জানতে ব্যাপক আগ্রহ হলো....। আমি পুরো নিশ্চিত হলাম যে ইসলাম পৃথিবীতে তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেনি; বরং রাসূলের সরলতা, বিচক্ষণতা, সততা, প্রতিশ্রুতি-রক্ষায় অবিচলতা, তাঁর আত্মত্যাগ, বিসর্জন, নিকটজন ও অনুসারীদের প্রতি নিষ্ঠা, আল্লাহর প্রতি ভরসা, নিজের পয়গামের প্রতি আস্থার সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব বীরত্ব ও সাহসিকতা– এসবই ইসলামের পথ সুগম করেছে। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে। ইসলামকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। রাসূলের জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার পরে আমি আফসোস করছিলাম, আরও বিস্তারিত জীবনী যদি পেতাম! (মহাত্মা গান্ধী সংকলন, ২৫ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

"কোটি কোটি মানুষের মনের মণিকোঠায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্বকারী মানুষটির জীবনে সম্পর্কে আমার জানতে ব্যাপক আগ্রহ হলো....। আমি পুরো নিশ্চিত হলাম যে ইসলাম পৃথিবীতে তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেনি"

গান্ধী

মাইকেল এইচ. হার্ট তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশ্বের একশত শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনী' শুরু করেছেন মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী দিয়ে। সবার আগে মুহাম্মাদ (সা.) এর নাম কেন নিয়ে এলেন, সেটার ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন, 'ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মাঝে মুহাম্মাদ কে কেন সবার আগে স্থান দেয়া হলো– বিষয়টি অনেককে বিস্মিত করতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনিই গোটা মানব ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন।' (দেখুন : The 100: A ranking of the most influential persons in History, p. 3)

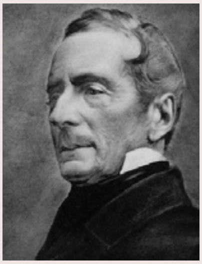

বিখ্যাত ফরাসী কবি আলফোন্স দা লামার্টিন তার 'তুরস্কের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপায় উপকরণের দৌর্বল্য এবং সুবিশাল সাফল্য এ তিনটি বিষয় যদি মানব প্রতিভার পরিচায়ক হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মুহাম্মদের সঙ্গে তুলনা করবে এমন কে আছে? (দেখুন : Histoire de la Turquie Vol: I, p. 111)

হিন্দু দার্শনিক রাককৃষ্ণ বলেছেন, কখনও বিজয় কখনও পরাজয়, কখনও ক্ষমতা কখনও অক্ষমতা, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও সমৃদ্ধি কখনও অভাব- এভাবে অসংখ্য পরিস্থিতির বদল হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.) কখনও বদলাননি। জীবনের সব সময় তিনি সেই মানুষটি ছিলেন, সেই গুণাবলি নিয়ে। এভাবে আল্লাহর সকল নবী কখনই বদলান না।

দেখুনঃ Muhammad the Prophet of Islam, p. 24)

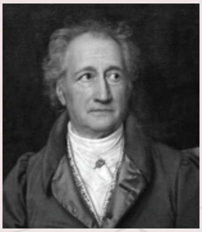

বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটে তাঁর বান্ধবীর কাছে লেখা একটি পত্রে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কথা লেখেন এভাবে : ৭০ বছর বয়স হওয়ার পরেও ইসলামের প্রতি আমার মুগ্ধতা কোনোদিনও কমেনি; বরং দিনে দিনে এটা বেড়েই চলছে।' (দেখুনঃ ক্যাথরিনা মমসেন কৃত Goethe und die rabische welt, p. 177)

অধ্যাপক স্টোবার্ট লিখেছেন, গোটা বিশ্ব মানবের ইতিহাসে মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্বের ধারেকাছে যাওয়ার মতো কোনো মানুষ নেই....। উপাদান-সামগ্রীর স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি যে অভাবনীয় কীর্তি সম্পাদন করেছেন সে অনুপাতে বিচার-বিবেচনা করা হলে, সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন একটি উজ্জ্বল নাম দৃষ্টিগোচর হবে না যেমনটি ছিল আরবী নবীর।" (দেখুন : Islam and its founder, p. 227-228)

সায়মন ওকলে তার 'মুসলিম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন, ইসলামের দাওয়াতের বিস্তার ও প্রসার যতটা না বিস্ময়কর ছিল, তার চেয়ে মহা বিস্ময়কর হলো যুগের পর যুগ তাঁর ধারাবাহিক পথচলা, অবিচলতা ও নিরবচ্ছিন্ন সামনে ধাবমানতা। যেই চমৎকার প্রভাব মুহাম্মাদ মক্কা ও মদীনাবাসীর ভেতরে রেখে গিয়েছিলেন, আজও সেটা সেই সৌন্দর্য সেই শক্তিমত্তার সঙ্গে ভারতীয়, আফ্রিকান ও তুর্কী নও মুসলিমদের হৃদয়ে সদা জাগৃত, সদা জীবন্ত। (দেখুন : History of the Saracen Empire, p. 45)

> যেই চমৎকার প্রভাব মুহাম্মাদ মক্কা ও মদীনাবাসীর ভেতরে রেখে গিয়েছিলেন, আজও সেটা সেই সৌন্দর্য সেই শক্তিমত্তার সঙ্গে ভারতীয়, আফ্রিকান ও তুর্কী নও মুসলিমদের হৃদয়ে সদা জাগৃত, সদা জীবন্ত।
>
> সায়মন ওকলে

খ্যাতিমান ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'সভ্যতার গল্প' গ্রন্থে লেখেন : মানব সমাজে কে কতখানি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন- এটাকে যদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ধরা হয়, তবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারবো : মুহাম্মাদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। বর্বরতার তিমিরে ডুবে থাকা, তৃষ্ণাতুর ধূ-ধু মরুভূর রুক্ষতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানো একটা জাতিতে হাতে ধরে তিনি উঠিয়ে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন শীর্ষদেশে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে তিনি ময়দানে নেমে ছিলেন। পরিশেষে লক্ষ্য পূরণে এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, সমগ্র ইতিহাসে অন্য কোনো সংস্কারক তাঁর সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি। স্বপ্ন বাস্তবায়নের যে ঈর্ষণীয় উদাহরণ পেশ করেছেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ মানবেতিহাসে সেটা নিতান্তই বিরল ঘটনা.....। তাঁর দাওয়াতের সূচনালগ্নে গোটা আরব ভূখণ্ড ছিল বিজন ধুধু মরুভূমি। কেবল এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল কিছু পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীর বাস ছিল এই প্রশস্ত ভূখণ্ডে। অথচ কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁর মৃত্যুর সময় তারা একটি সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত জাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি তাদের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও জাত্যাভিমানের লাগাম টেনে ধরলেন। ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও আরব ভূখণ্ডের প্রাচীন ধর্মের ওপর তিনি নিয়ে এলেন একটি সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও শক্তিশালী ধর্মকে। চরিত্র ও নৈতিকতার এমন একটা প্রাসাদ গড়ে তুললেন, যার ভিত্তি ছিল জাতিগত বীরত্ব, সম্মান, মর্যাদা। এক প্রজন্মের ভেতরেই তারা শত যুদ্ধে বিজয় লাভ করলো। এক শতাব্দীর মাঝে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিশাল এক সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে গেলো। আজও অর্ধেক পৃথিবীতে তারা মহা গুরুত্বপূর্ণ এক শক্তি হয়ে বেঁচে আছে।'
(দেখুন : The Story of Civilization: the age of faith, Vol: IV, p. 174)

> ''মানব সমাজে কে কতখানি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন- এটাকে যদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ধরা হয়, তবে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারবোঃ মুহাম্মাদ ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।''
>
> উইল ডুরান্ট

মুহাম্মাদ (সা.) এর এক সময়ের ঘোরতর শত্রু আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের আগে তার একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে যখন নবীজী (সা.) এর দাওয়াত সংবলিত চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছলো, তখন তিনি নিদারুণ বিস্মিত হলেন। চিঠির প্রেরকের সঙ্গে পরিচয়ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো আরবকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তখন আবু সুফিয়ান (ইসলামের মহাশত্রু ও কুরাইশ নেতা) শাম দেশে ছিলেন। তখন তাকে ও তার সঙ্গীদের রাজপ্রাসাদে ডাকা হলো। দোভাষীর মাধ্যমে সম্রাট তাকে বেশকিছু বুদ্ধিদীপ্ত ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্ন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল নবীজী সত্য কি মিথ্যা সেটা পরখ করা। আবু সুফিয়ানের জবাব পাওয়ার পরে হিরাক্লিয়াস তাকে লক্ষ করে বললেন:

আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি বলেছো তিনি তোমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত। এভাবেই রাসূলদের সম্ভ্রান্ত পরিবারে পাঠানো হয়ে থাকে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তার আগে তোমাদের কেউ এমন (নবুওয়াতের) দাবি করেছে কি না? তুমি বলেছো, না। যদি সত্যিই তার আগে এমন দাবি কেউ করে থাকতো, তবে আমি তাকে সেই ব্যক্তির মুরীদ বলতাম।

এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর মিশন শুরু করার আগে তোমরা কখনও তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছো কি না? তুমি বলেছো, না। যে লোকটি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলে না, সে আল্লাহর ব্যাপারে কীভাবে মিথ্যা বলবে?

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সম্ভ্রান্তরা তার অনুসরণ করে নাকি দুর্বলরা? তুমি বলেছো দুর্বলরা তার অনুসরণ করেছে। যুগে যুগে তারাই ছিল রাসূলদের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে? তুমি বলেছো তারা বেড়ে চলছে। এটাই হলো ঈমানের বৈশিষ্ট্য। পূর্ণতা পাওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়তেই থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি নতুন এ ধর্মে প্রবেশের পর কেউ কি বিরক্তভরে সেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে? তুমি বলেছো, না। এটাই মূলত ঈমান, যখন সেটা হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করে তখন কিছু সেটার প্রতি বিরক্তি আসে না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না? তুমি বলেছো, না। এভাবেই রাসূলগণ বিশ্বাসঘাতকতা করেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? তখন তুমি বলেছো, তিনি আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করার আদেশ দেন। তিনি মূর্তিপূজা নিষেধ করেন। নামাজ, সততা ও পবিত্রতার উপদেশ দেন।

তুমি যা বলেছো এগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে মনে রেখো তিনি আমার দু'পায়ের এই নিচের জায়গাটাও একদিন নিয়ে নিবেন। আমার জানা ছিলো তিনি এখন প্রকাশ পাবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের (আরবদের) মধ্য থেকে হবেন, এটা জানা ছিল না। যদি আমি জানতাম যে তার কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে আমি তাকে দেখতে যেতাম'। (বুখারী: ৭)

মুহাম্মাদ রাসূলের চরিত্র-মাধুর্য্যের কাহিনী

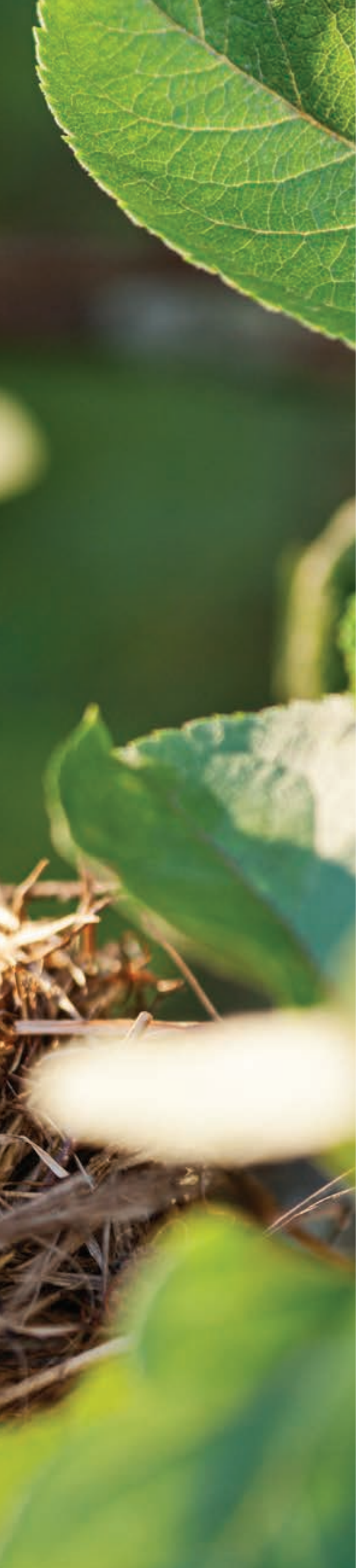

আল্লাহর

আল্লাহর রাসূল ছিলেন সর্বোত্তম মানবীয় চরিত্র-মাধুরির সবোর্ৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যসন্ধানী সকল মনীষী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাদ যায়নি তাঁর দুশমনরাও। এ কারণেই কুরআনে তাকে ‘মহান চরিত্রের অধিকারী’ বলা হয়েছে।

যখন নবীজীর স্ত্রী আয়েশা রা. কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি সেই মহান চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনা দিতে অপারগ হয়ে এক কথায় বললেন, 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'। এর মর্ম হলো, তিনি ছিলেন কুরআনী শিক্ষা ও নৈতিকতার বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ।

নিচে আমরা নবীজীর চরিত্র-মাধুরীর কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো:

বিনয়:

আল্লাহর রাসূল তাঁর সম্মানে কারও দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না; বরং তিনি তাঁর সাথীদের এটা করতে বারণ করতেন। সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় নবীকে কত বেশি ভালোবাসতেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। (আহমদ: ১২৩৪৫)

আদী বিন হাতেম রা.। আরবের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন। ইসলাম গ্রহণের আগে একবার নবীজী (সা.) এর কাছে এলেন। তিনি বলেন, 'আমি দেখলাম তাঁর কাছে একজন মহিলা ও কয়েকটি বাচ্চা। তারা রাসূলের এতটা কাছে ও এতটা স্বাভাবিকভাবে বসা ছিল যে আমি বুঝতে পারলাম তিনি রোম কিংবা পারস্যের বাদশাহ নন'। (আহমদ: ১৯৩৮১) বিনয় সকল নবীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে তাদের মতো হয়ে বসতেন। আলাদা হয়ে বসতেন না। সে কারণে অপরিচিত কোনো লোক নবীজীর মজলিসে এলে তাঁকে চিনতে পারতো না। জিজ্ঞাসা করতে হতো, মুহাম্মাদ কে? (বুখারী: ৬৩)

সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী তাঁর সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও এদিক সেদিক গিয়ে মানুষের ছোট ছোট কাজগুলোও করে দিতেন। কখনও দেখা যেতো যে মদীনার কেনো সামান্য দাসী-বাঁদী এসেও নবীজীর হাত ধরে তাকে নিজের প্রয়োজনে যেখানে খুশি নিয়ে যেতো'! (বুখারী: ৫৭২৪)

> ইসলামের রাসূল দৈনন্দিনের ব্যক্তিগত কাজগুলো নিজে নিজেই করতেন। পরিবারের সাহায্য করতেন। গৃহস্থলী কাজে অংশ নিতেন।

বিখ্যাত সাহাবী উমর রা. বর্ণনা করেন, একবার তিনি নবীজী মুহাম্মাদ (সা.) এর কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন তাঁর গায়ে চাটাইয়ের দাগ কেটে আছে। উমর কেঁদে ফেললেন। নবীজী (সা.) বললেন, কাঁদছো কেন? উমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্যের বাদশাহ কতটা ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত। আর আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে (এত কষ্ট করছেন)? তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তাদের জন্য ইহকাল আর আমাদের জন্য পরকাল? (বুখারী: ৩৫০৩)

দৈনন্দিনের ব্যক্তিগত কাজগুলো তিনি নিজে নিজেই করতেন। পরিবারের সাহায্য করতেন। গৃহস্থলী কাজে অংশ নিতেন। যখন তাঁর স্ত্রী আয়েশা রা. কে তিনি ঘরে কী করেন সেটা জানতে চাওয়া হলো, আয়েশা রা. বললেন, 'তিনি তাঁর পরিবারের সহযোগিতা করতেন' (বুখারী ৬৪৪)। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা যা করো সেটাই করতেন। জুতা পরিস্কার করতেন। জামা-কাপড় ঠিক করতেন'। (আহমদ: ২৪৭৪৯)

আল্লাহর রাসূল বলেন, যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম: ৯১)

দয়া ও অনুগ্রহ

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, 'অনুগ্রহকারীদের দয়াময় আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করো, আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'। (আবু দাউদ: ৪৯৪১)

নবীজী (সা.) এর দয়া ও অনুগ্রহের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। নিচে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে:

শিশুদের প্রতি অনুগ্রহ:

- নামাজ ইসলামের ভিত্তি। নামাজে কথা বলার অনুমতি নেই। অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়ার অনুমতি নেই। অথচ নবীজী (সা.) একবার যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন তাঁর নাতনী উমামা বিনে যয়নব তাঁর কোলে ছিল। যখন তিনি সিজদায় যেতেন উমামাকে মাটিতে রাখতেন। সিজদা থেকে উঠে আবার কোলে তুলে নিতেন। (বুখারী: ৪৯৪)
- নবীজী নামাজের মাঝে যদি কখনও কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ পেতেন, দ্রুত গতিতে নামাজ শেষ করতেন। তিনি বলেন, অনেক সময় আমি নামাজে দাঁড়িয়ে লম্বা করে আদায়ের ইচ্ছা করি। কিন্তু তখন দেখা যায় কোনো শিশুর আওয়াজ আমার কানে আসে। তখন আমি সংক্ষেপে নামাজ শেষ করি। কারণ তাঁর মায়ের কষ্ট হোক সেটা আমার পছন্দ না'। (বুখারী: ৬৭৫)

নারীদের প্রতি অনুগ্রহ:

- নবীজী (সা.) মেয়েদের দেখাশোনা ও তাদের প্রতি সদাচরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলতেন, 'যাকে আল্লাহ একজন বা কয়েকজন মেয়ে দান করেছেন। অতঃপর সে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করলো, তাদের প্রতি সদাচরণ করলো, তারা পরকালের তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকবচ হবে'। (বুখারী: ৫৬৪৯)
- নবীজী স্ত্রীর অধিকার রক্ষা, তাঁর যত্ন নেয়া এবং তাঁর সার্বিক বিষয়ের লক্ষ রাখার ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে পারস্পরিক উপদেশ দেয়ারও আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নারীদের ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সদুপদেশ দান করো'। (বুখারী: ৪৮৯০)

- কেবল কথায় নয়; পরিবারের নারী সদস্যদের সঙ্গে সদাচরণের সর্বোত্তম উদাহরণ নিজেই কাজের মাধ্যমে পেশ করেছেন। একারণে একদিন দেখা গেলো, তিনি তাঁর উটের পাশে হাঁটু দিয়ে বসলেন। স্ত্রী সাফিয়্যা রা. তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে উটে আরোহণ করলেন! (বুখারী: ২১২০)
- মেয়ে ফাতেমা রা. যখনই তাঁর কাছে আসতেন, তিনি তার হাত ধরতেন এবং চুম্বন করতেন। পরে নিজের জায়গায় নিয়ে তাকে বসাতেন। (আবু দাঊদ: ৫২১৭)

দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহ:

- নবী (সা.) অনাথ ও ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলতেন, 'আমি ও অনাথের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে 'এভাবে' থাকবো- একথা বলে তিনি শাহাদাত আঙুল ও তর্জনী কাছাকাছি রেখে ইঙ্গিত করলেন (খুব নৈকট্য বুঝালেন)। (বুখারী: ৪৯৯৮)
- বিধবা ও দরিদ্রদের সহায়তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও দিন-রাত নামাজ-রোজা পালনের সমতুল্য পুণ্যের কাজ ঘোষণা করেছেন। (বুখারী: ৫৬৬১)
- দুর্বলদের প্রতি দয়া ও তাদেরকে তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেয়াকে উপার্জনে বরকত এবং দুশমনের ওপর বিজয় লাভের মাধ্যম বর্ণনা করেছেন। নবীজী (সা.) বলেন, দুর্বলদের মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে চাও। কেননা তোমাদেরকে তাদের উসীলাতে বিজয় ও রিজিক দান করা হয়'। (আবু দাঊদ: ২৫৯৪)

" দুর্বলদের সহায়তা ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনকে রাসূল মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর সাহায্য ও রিযিক লাভের কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

জীব-জন্তুর প্রতি অনুগ্রহ:

- নবীজী জীবজন্তুর প্রতি দয়া ও কোমল আচরণে উদ্বুদ্ধ করতেন। সেগুলোকে কষ্ট দিতে কিংবা সাধ্যের বেশি বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করতেন। এমনকি প্রয়োজনে যবেহ করলে তখনও যেন পশুটির কষ্ট কম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলতেন। আল্লাহর রাসল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর ওপর কোমলতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করো, তখন কোমলতার সঙ্গে করো। যখন যবেহ করো, সুন্দর ও কোমলভাবে করো। যবেহ করার আগে ছুরি ধার করে নাও। পশুকে শান্তি দাও। (মুসলিম: ১৯৫৫)
- তিনি (সা.) বলেছেন, একজন মহিলার একটি বিড়াল ছিল। মহিলা সেটাকে আটকে রাখতো। নিজে খাবার দিতো না। তাকেও এদিক সেদিক কুড়িয়ে খেতে দিতো না। ফলে সে মহিলাটি জাহান্নামে যায়। (বুখারী: ৩১৪০)
- জনৈক সাহাবীর বর্ণনা, আমরা এক সফরে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রয়োজনে একটু দূরে গেলেন। আমরা বাচ্চাসহ একটা দেখলাম। সেখান থেকে দু'টি বাচ্চা ধরে ফেললাম। তখন মা পাখিটি এসে ছটফট করতে লাগলো। এমন সময় নবীজী (সা.) এলেন। অবস্থা তিনি বললেন, 'কে পাখিটার বাচ্চা নিয়ে তাকে কষ্ট দিচ্ছে? দ্রুত তার বাচ্চা তাকে দিয়ে দাও'। (আবু দাউদ: ২৬৭৫)

> ইসলামের রাসূল জীব-জন্তুর প্রতি সদয় আচরণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলোর ওপর সাধ্যাতীত কাজ চাপাতে নিষেধ করেছেন। পশু-পাখিকে যে কষ্ট দিবে তাকে শাস্তির ধমক দিয়েছেন।

ন্যায়-নীতি:

- রাসূল (সা.) ন্যায়-পরায়ণতার সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন। নিজের অতি আপনজনের ব্যাপারেও শরীয়তের বিধি প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ আল্লাহর বাণী রয়েছে: হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আল্লাহর সাক্ষী হও। যদিও সেটা নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা নিজেদের মাতা-পিতা কিংবা আপনজনের বিরুদ্ধেও হয়। (নিসা: ১৩৫)
- একবার জনৈক সাহাবী চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত অথচ সম্ভ্রান্ত- এমন এক নারীর ব্যাপারে নবীজীর কাছে এসে সুপারিশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তখন নবীজী (সা.) বললেন, 'আল্লাহর শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করতো, তবে তাকে আমি শাস্তি দিতাম'। (বুখারী: ৪০৫৩)
- যখন সুদ হারাম করা হলো, তখন তিনি একেবারে নিকটাত্মীয়দের দিয়ে শুরু করলেন। তাদেরকে সুদের টাকা গ্রহন করতে নিষেধ করলেন। সবার আগে বারণ করলেন চাচা আব্বাসকে। তিনি বললেন, 'সর্বপ্রথম আমাদের সুদ নাকচ করা হলো। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান আব্বাসের সুদ। সেটা বাতিল ঘোষণা করা হলো'!

- নবীজী (সা.) সভ্যতার বিকাশ, উন্নতি ও সমৃদ্ধির মাপকাঠি নির্ধারণ করলেন দরিদ্র ও দুর্বলদের অধিকার আদায়ের ভিত্তিতে। যে সভ্যতায় দুর্বল কোনো ভীতিহীনভাবে সবলের কাছ থেকে অধিকার বুঝে পায়, সেটাই প্রকৃত সভ্যতা। তিনি বলেন, সে জাতি সমৃদ্ধ হবে না যার দুর্বলরা নির্দ্বিধায় সবলের কাছ প্রাপ্য বুঝে না পায়'। (ইবনে মাজাহ: ২৪২৬)

উদারতা ও বদান্যতা:

- এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে কিছু চাইলো। তিনি বললেন, তোমার যা ভালো লাগে কিনে নাও। আমি মূল্য পরিশোধ করে দিবো। তখন সাহাবী উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার ওপর সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিয়ে দেননি। নবীজী কথাটি পছন্দ করলেন না। অপরদিকে সেই লোকটি তাঁকে বললো, আপনি ব্যায় করুন। আরশওয়ালার ভাণ্ডারে অভাবের ভয় করবেন না। তখন নবীজী মৃদু হাসলেন। তাঁর বদনে পুলকের আভা ফুটে উঠলো।
- নবীজীর কাছে আশি হাজার রৌপ্য মুদ্রা এসে পৌঁছলো। তিনি সেগুলো একটি চাটাইয়ের ওপর রেখে বণ্টন করা শুরু করলেন। যে এলো তাকেই দিলেন। এক পর্যায়ে সব শেষ হয়ে গেলো। (হাকেম: ৫৪২৩)
- আল্লাহর রাসূল হুনাইন যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এটা তায়েফের নিকটবর্তী একটি জায়গা। তখন অসংখ্য নওমুসলিম বেদুইন তাঁর কাছে এসে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দাবি করতে লাগলো। প্রচণ্ড হুড়াহুড়ি ও হুটোপাটি করে তারা রাসূলকে একটি গাছের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললো। অনেকে রাসূলের চাদর খুলে নিয়ে গেলো। তিনি তখন বললেন, 'তোমরা আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এখানের বৃক্ষগুলো পরিমাণ সম্পদও থাকতো আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম। তোমরা দেখতে আমি কৃপণ, মিথ্যাবাদী কিংবা কাপুরুষ নই'। (বুখারী: ২৯৭৯)

ধৈর্য ও সহনশীলতা:

- মক্কা থেকে ৯০ কি.মি. দূরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল তায়েফ শহর। নবীজী (সা.) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন সেখানে। কিন্তু তায়েফের অধিবাসীরা তাঁর দাওয়াতে নেতিবাচক সাড়া দিলো। তাকে ভয়ংকর কষ্ট দিলো। নবীজী ভগ্ন-মনোরথ হয়ে তায়েফ থেকে বের হয়ে মক্কার পথ ধরলেন। এমন সময় আল্লাহ তাঁর কাছে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করলেন। ফিরিশতা রাসূলের কাছে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলে নবীজী বললেন, 'বরং আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা হয়তো তাদের বংশধরের ভেতরে এমন কিছু মানুষ বানাবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না'। (বুখারী: ৩০৫৯)
- একবার এক অসভ্য বেদুঈন রাসূলের কাছে এসে প্রচণ্ডভাবে তাঁর চাদর টেনে ধরলো। এতে নবীজীর ঘাড়ে দাগ পড়ে গেলো। লোকটি চিৎকার করে নবীজীকে বলতে লাগলো, আল্লাহর যেসব সম্পত্তি আপনার কাছে আছে আমাকে কিছু দিতে বলুন। পরিস্থিতির বিভৎসতা দেখে সাহাবায়ে কিরাম জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসছিলেন। কিন্তু নবীজী (সা.) লোকটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হাসলেন। এরপর সাহাবাদেরকে বললেন তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছু দিয়ে দাও'। (বুখারী: ২৯৮০)

> নবী জীবনের সকল তথ্য-উপাত্ত এ ব্যাপারে একমত যে তিনি তাঁর জীবনে কোনো সম্পদ জমা করে রাখেননি।

- মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সহনশীলতার যে অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন সেটা মানবেতিহাসে বিরল। এই মক্কাবাসীরাই তাঁকে একদিন তাঁর বাড়ি ও জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বছরের পর তাঁকে মুখে ও হাতিয়ার দিয়ে কষ্ট দিয়েছে; বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রচেষ্টাই তারা বাদ রাখেনি। সেই তিনি যখন আল্লাহর সাহায্য লাভ করলেন, মক্কা জয় করলেন, মক্কাবাসীদের পদানত করলেন, তখন তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে কী করবো বলে তোমরা ভাবছো'? তারা বললেন, ভালোর প্রত্যাশা করছি। আপনি মহান ভাই, মহান ভাইয়ের ছেলে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে কেবল তা-ই বলবো যা আমার ভাই ইউসুফ বলেছিলেন (আল্লাহর নবী ইউসুফ তাঁকে কষ্টদানকারী ও কূপে নিক্ষেপকারী ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন)। তিনি তাদের বলেছিলেন, আজ তোমাদের ওপর কোনো প্রতিশোধ নেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দিন। তিনি পরম করুণাময় দয়ালু (ইউসুফ: ৯২)। সুতরাং যাও তোমরা আজকে সবাই মুক্ত। (বাইহাকী: ১৮২৭৫)

জগতের প্রতি নির্লিপ্ততা ও নিরাসক্তি:

- নবীজী (সা.) ছিলেন পার্থিব জীবনের প্রতি নিরাসক্তির প্রদীপ্ত উদাহরণ। তিনি ছিলেন কুরআনের নিম্ন-বর্ণিত আয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি: তাদের আমি পরীক্ষা-স্বরূপ দুনিয়ার যে ভোগ-সৌন্দর্য্য দান করেছি, আপনি সেগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না। আপনার প্রভুর দান সর্বোত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। (ত্বহা: ১৩১)

- একবার সাহাবী উমর রা. তাঁর কাছে এলেন। তখন নবীজী চাদরবিহীন একটি খোলা চাটাইয়ের ওপর শায়িত ছিলেন। এতে করে তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসে গিয়েছিল। উমর রা. বলেন, আমি তখন তাঁর ঘরের চারদিকে দৃষ্টি দিলাম। আল্লাহর শপথ! পুরো ঘরে দেখার মতো কোনো জিনিস আমার চোখে পড়েনি। তখন আমি বললাম, আপনি দুআ করুন আল্লাহ যেন আপনার উম্মতকে পার্থিব সমৃদ্ধি দান করেন। কেননা রোমান ও পারসিকরা আল্লাহর ইবাদত না করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে দুনিয়ার সমৃদ্ধি দান করেছেন। তখন নবীজী বললেন,'হে খাত্তাবের ছেলে তুমি কি সন্দেহে পড়ে গেলে নাকি? তারা তো সেসব লোক যাদেরকে তাদের সমৃদ্ধি পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে'। (বুখারী: ২৩৩৬)

- তিনি বলতেন, আমার আর পৃথবীর কী সম্পর্ক? আমি তো পৃথিবীতে একজন মুসাফিরের মতো, যে খানিক মুহূর্ত একটা গাছের নিচে বিশ্রাম নিলো। এরপর উঠে পথ চলতে শুরু করলো'। (তিরমিযী: ২৩৭৭)

- অনেক সময় দুই মাস বা তিন মাস হয়ে যেতো কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কেনো ঘরে রান্নার জন্য আগুন জ্বলতো না। সবাই খেজুর আর পানি খেয়ে থাকতেন (বুখারী: ২৪২৮)। অনেক সময় পুরো দিন না খেয়েই পার করে দিতেন। পেটে দেয়ার মতো একটা নিম্নমানের খেজুরও থাকতো না (মুসলিম: ২৯৭৭)। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নবীজী কখনও একটানা তিন দিন গমের রুটি দিয়ে পেটভরে আহার করেননি! অধিকাংশ সময়ই তিনি যবের রুটি খেতেন (মুসলিম ২৯৭৬)।

- তাঁর আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিতির উৎস ছিল মানুষের উপকার ও অভাবীদের সহায়তা করা। জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি মদীনাতে নবীজী (সা.) এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। এ সময় আমরা উহুদ পর্বতের (মদীনার অন্যতম অতিকায় পর্বত) কাছে এসে পৌঁছলাম। তিনি বললেন, 'আবু যর'! আমি বললাম, জ্বী আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, যদি এই উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও আমার হাতে আসে, তবে তিন দিন পর ঋণ বাবদ ছাড়া একটা দীনারও বাকি থাকবে সেটা আমার পছন্দ না। আমি ডানে বামে, সামনে পেছনে চতুর্দিকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সেগুলো বণ্টন করে দিবো। অতঃপর তিনি চলতে চলতে বললেন, ইহকালে যার যত সম্পদ ও মর্যাদা বেশি থাকবে, পরকালে তার তত কম মর্যাদা হবে। কিন্তু কেউ যদি তার সম্পদ ও পদমর্যাদাকে অভাবী মানুষের সেবায় কাজে লাগায় সেটা ব্যতিক্রম। এরপর তিনি হাতের আঙুল দিয়ে চারদিকে ইশারা করে দেখালেন দান সর্বব্যাপী হওয়া উচিত। (বুখারী: ৬০৭৯)

> ইসলামের রাসূল তাঁর পার্থিব জীবনকে একজন মুসাফিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে কোনো একটা গাছের ছায়ায় বসে সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়। খানিক পরেই উঠে আবার নিজের পথে হাঁটতে শুরু করে।

ওয়াদা পূরণ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা:

- অঙ্গীকার পূরণ উন্নত ও সম্ভ্রান্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোনো চুক্তি ছাড়াই কেবল কৃতজ্ঞতা হিসেবে ওয়াদা রক্ষা করা মহানুভবতার পরিচায়ক। আর এটাই ছিল নবীজী (সা.) এর স্বভাব। কেনো চুক্তি ও পতিশ্রুতি ছাড়াও তিনি কারও অনুগ্রহের উত্তম বদলা দিতেন। আর চুক্তি থাকলে সেটার প্রতি কত যত্নশীল ছিলেন সেটা তো বলাবাহুল্য।
- খ্রিস্টান বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কুরাইশ কাফেরদের নবীজীর গুণাবলির কথা জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন? তখন তারা বলেছিল, না। তখন সম্রাট বললেন, এভাবেই রাসূলগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। (বুখারী: ৭)
- এ কারণেই কুরাইশদের সঙ্গে নবীজীর যেসব চুক্তি ছিল সেগুলোর প্রতি তিনি পরম যত্নবান ছিলেন। অথচ কুরাইশরা অহর্নিশ নবীজীর সঙ্গে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করতো।
- কেবল জীবিত নয়; মৃতের প্রতিও তিনি ছিলেন ওফাদার। কেবল কারও সামনে নয়; পেছনেও তিনি ছিলেন সমান ওফাদার।
- প্রথমা স্ত্রী খাদীজা রা. এর প্রতি তিনি ছিলেন পরম ওফাদার। মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর হৃদয়ে খাদীজার মর্যাদা ধরে রেখেছিলেন। তাঁর অনুগ্রহ ও অবদানের স্বীকৃতি দিতেন। খাদীজার আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন।

প্রথমা স্ত্রী খাদীজা রা. এর প্রতি তিনি ছিলেন পরম ওফাদার। মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর হৃদয়ে খাদীজার মর্যাদা ধরে রেখেছিলেন। তাঁর অনুগ্রহ ও অবদানের স্বীকৃতি দিতেন। খাদীজার আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন।

- রাসূল (সা.) এর প্রথমা স্ত্রী খাদিজা রা. এর মৃত্যু হয়েছিল নবুওতের প্রথম দিকে। আয়েশা রা. এর বিয়ের আগে। এজন্য আয়েশা রা. তাকে চিনতেন না। এতদ্বসত্ত্বেও তাঁর প্রতি নবীজীর বিশ্বস্ততার বর্ণনা শুনিয়েছেন আমাদেরকে। তিনি বলেন, নবীজী (সা.) তাঁকে খুব মনে করতেন। কখনও কখনও বকরী যবেহ করে সেগুলো ভাগ ভাগ করে খাদীজার বিভিন্ন বান্ধবীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমি বলে ফেললাম, দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোনো মহিলা নেই? তিনি বললেন, সে এমন ছিল... সে অমন ছিল.... তাঁর অনেক গুণাবলির কথা উল্লেখ করলেন। (বুখারী: ৩৬০৭)
- একবার হাবশার বাদশাহ নাজাসীর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল নবীজীর দরবারে এলো। এই বাদশাহ নাজাসীই ইসলামের প্রথম যুগে তার দেশে আশ্রিত মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবীজী

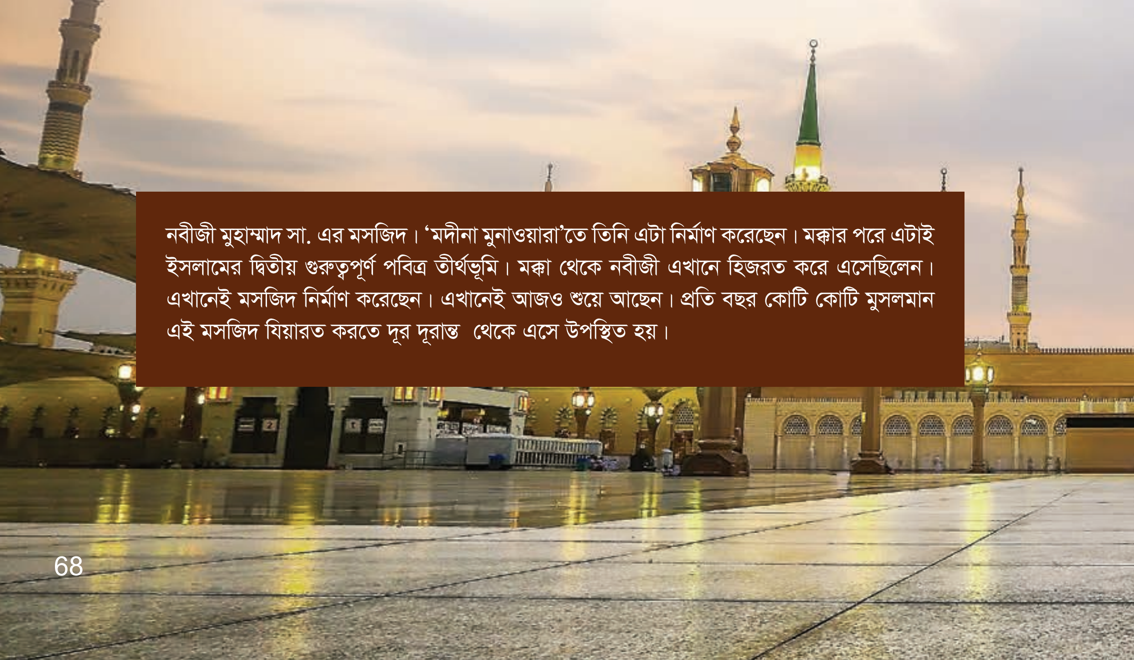

নবীজী মুহাম্মাদ সা. এর মসজিদ। 'মদীনা মুনাওয়ারা'তে তিনি এটা নির্মাণ করেছেন। মক্কার পরে এটাই ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র তীর্থভূমি। মক্কা থেকে নবীজী এখানে হিজরত করে এসেছিলেন। এখানেই মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এখানেই আজও শুয়ে আছেন। প্রতি বছর কোটি কোটি মুসলমান এই মসজিদ যিয়ারত করতে দূর দূরান্ত থেকে এসে উপস্থিত হয়।

নিজে উঠে প্রতিনিধি দলের সেবা করতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা আছি তো! তিনি বললেন, তারা আমার সঙ্গীদের সম্মান করেছিল। আমি চাই আজকে তাদের সেই অনুগ্রহের বদলা দিবো'। (শুআবুল ঈমান: ৮৭০৪)

- তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতিও ওফাদার ছিলেন। আট বছর বয়সী কিশোর মুহাম্মাদের প্রতি চাচা আবু তালেব কতটা সদয় ও যত্নশীল ছিলেন সেটা আজীবন ভুলেননি। এ কারণেই আবু তালিবের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। বরং মৃত্যুর পরেও নিষেধাজ্ঞা আসার আগ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন।

- সাহাবীদের সঙ্গে নবীজীর ওফাদারি ও বিশ্বস্ততার এক অনুপম উদাহরণ ছিল সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআর ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগঘন মুহূর্তে হাতেব নবীজীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তিনি কুরাইশদেরকে নবীজীর ও তাঁর বাহিনীর আসার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছিলেন। এমন একটি গুরতর অপরাধের পরেও নবীজী হাতেবের অতীতের কারণে, বিশেষত বদরের যুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এক সাহাবী হাতেবের অপরাধের শাস্তি দিতে চাইলে নবীজী তাকে বললেন, 'সে (হাতেব) বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তুমি কি জানো আল্লাহ তাআলা হয়তো বদরবাসীদের প্রতি লক্ষ করে বলেছেন, তোমরা যা খুশি করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'! (মুসলিম: ২৪৯৪)

আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের অনুসরণে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নবীজী (সা.) উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করে গিয়েছেন জীবনভর।

মুহাম্মাদ (সা.) এর নির্বাচিত বাণী

মুসলমানরা যুগে যুগে নবীজী (সা.) এর বক্তব্য ও বাণীগুলোকে মুখেমুখে ও লেখার মাধ্যমে অত্যধিক যত্নের সঙ্গে উত্তর-প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে গেছেন। উলামায়ে কিরাম নবীজী (সা.) এর মুখ-নিঃসৃত হুবহু শব্দগুলোকে নির্ণয় ও সংরক্ষণ করে গেছেন। আর এভাবেই তারা বিশ্বের সামনে পেশ করেছেন নবীজীর বাণীসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শুদ্ধতা নির্ণয়, এমনকি শব্দ ও বাক্যের ক্ষেত্রেও ভুল-শুদ্ধ, সত্য-মিথ্যা, সংযোজন-বিয়োজন যাচাইয়ের এক নতুন বিস্ময়কর উদাহরণ।

নিচে আমরা নবীজীর (সা.) কিছু মুখ নিঃসৃত বাণী উল্লেখ করছিঃ

- ‘মানুষের সকল কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের প্রতিদান হবে তার নিয়ত অনুসারে’। (বুখারীঃ ১)
- ‘পুণ্য হলো সচ্চরিত্র। আর পাপ হলো যেটা মনে খটকা তৈরি করে এবং কেউ জানুক এটা ভালো না লাগে’।
- ‘তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। পাপ করে ফেললে এরপর পুণ্য করে আগের পাপটাকে মিটিয়ে ফেলো। মানুষের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের আচরণ করো’। (তিরমিযীঃ ১৯৮৭)
- ‘দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ করো না আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের সম্পদে আগ্রহ করো না মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে’। (ইবনে মাজাহঃ ৪১০২)
- ‘আমি আর আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে একটি ঘর বানালো। পুরো ঘরটি বেশ সুন্দর করে সাজালো। কিন্তু এক কোণে একটি ইট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখলো। মানুষ যখন ঘরটি চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখলো, সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, এখানের ইটটি কেন বসাচ্ছো না? নবীজী বলেন, আমিই হলাম সেই ইটের মতো। আমি সর্বশেষ নবী’। (বুখারীঃ ৩৩৪২)
- ‘যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্ট-পেরেশানী দূর করবে,আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট-পেরেশানী দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো জটিলতায় নিপতিত লোকের জটিলতা সহজ করে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার ইহকাল ও পরকালকে সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অপর কোনো মানুষের সহায়তা করে, আল্লাহ তাআলা তার সহায়তা করেন। যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন..। কর্মে কেউ পিছিয়ে থাকলে বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না’। (মুসলিমঃ ২৬৯৯)

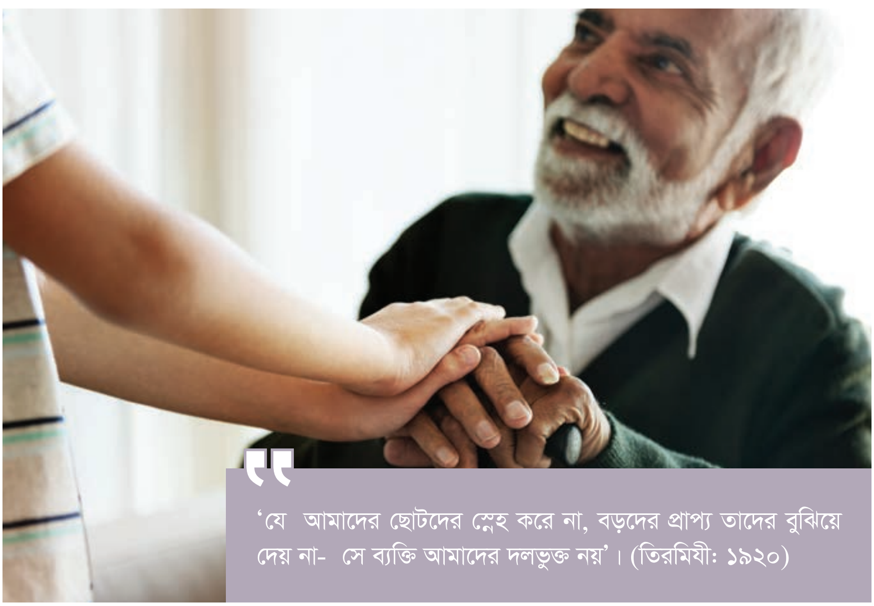

“

‘যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের প্রাপ্য তাদের বুঝিয়ে দেয় না- সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়’। (তিরমিযীঃ ১৯২০)

‘তোমরা মুমিন হওয়ার আগ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর ততক্ষণ (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কোনো পথ বলে দিবো না যাতে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরি হবে? নিজেদের ভেতরে সালামের প্রসার ঘটাও’। (মুসলিম: ৫৪)

- ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে’। (বুখারী: ১৩)
- ‘(প্রকৃত) মুসলিম হলো সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। (প্রকৃত) হিজরতকারী হলো সে ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করে’। (বুখারী: ১০)
- ‘সাবধান! যদি কেউ কোনো অমুসলিমকে জুলুম করে অথবা তার ওপর সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেয়, কিংবা তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কোনো কিছু নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হয়ে লড়াই করবো’। (আবু দাঊদ: ৩০৫২)
- ‘দয়াময় আল্লাহ তাআলা দয়া প্রদর্শনকারীদের দয়া করেন। পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া করো। আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন’। (আবু দাঊদ: ৪৯৪১)
- ‘যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়’। (তিরমিযী: ১৩১৫)
- ‘পারস্পরিক ভালোবাসা, অনুকম্পা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে সকল মুমিন এক দেহের ন্যায়। যখন এ দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক দেহের জন্য গোটা দেহ রাত জেগে থাকে, রোগে-শোকে ভোগে’। (মুসলিম: ২৫৮৬)
- ‘তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসক দায়িত্বশীল। তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীগৃহে দায়িত্বশীল। তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। মনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে’। (বুখারী: ৪৮৯২)
- ‘সে ব্যক্তি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম’। (তিরমিযী: ১১৬২)

- ‘তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম’। (তিরমিযীঃ ৩৮৯৫)
- ‘আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে কোমলতাকে পছন্দ করেন’। (বুখারীঃ ৫৬৭৮)। তিনি আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত হলো, সে বিশাল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো’। (মুসলিমঃ ২৫৯২)
- ‘মুনাফিকের আলামত তিনটিঃ মিথ্যা কথা বলে। ওয়াদা ভঙ্গ করে। আমানতের খেয়ানত করে’। (বুখারীঃ ৩৩)
- ‘ইসলামের সৌন্দর্য হলো অর্থহীন বিষয় পরিহার করা’। (তিরমিযীঃ ২৩১৭)
- ‘এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে প্রচণ্ড তৃষাক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করলেন। কূপ থেকে বের হয়ে আসতেই সামনে একটি তৃষ্ণা-কাতর কুকুর দেখতে পেলেন। প্রচণ্ড তৃষাতুর হয়ে কুকুরটি মাটি চাটছিল। তিনি মনে মনে বললেন, কুকুরটিও আমার মতো প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত। তখন তিনি আবার কূপে নেমে নিজের মোজায় করে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করালেন। আল্লাহ তাআলা তার এই সৎকর্মে খুশি হয়ে বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ঘটনাটি শুনে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জীব-জন্তুর মাঝেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক সজীব কলিজার (প্রাণ) মাঝেই প্রতিদান রয়েছে’। (বুখারীঃ ২৪৬৬)

কুরআনের তুলিতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা.

কুরআন আমাদের নবীজীর ব্যক্তিত্ব ও আশপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণের এক বিস্ময়কর দিক তুলে ধরে। আর এর ভেতর দিয়েই একসঙ্গে তাঁর চরিত্র-মাধুরী ও তাঁর মানবীয় সত্তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে:

- তিনি গোটা জগতবাসীর জন্য রহমত (আম্বিয়া: ১০৭)। সুতরাং তিনি কেবল মুসলমানদের জন্য নন।
- তিনি মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী (ক্বলম: ৪)
- গোটা মানবতার সুপথপ্রাপ্তির জন্য তিনি ছিলেন সদা সমাকুল। তাদের বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার কথা চিন্তা করে তিনি ছিলেন চরম মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন। তাঁর এ উদ্বেগ এতটা বেশি ছিল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিকবার তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁর দায়িত্ব কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। হেদায়াত তাঁর হাতে নয়; হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হাতে (হূদ: ১২; আনআম: ১০৭; কাহাফ: ১১০)
- তিনি মানুষের (ভুল হয়ে গেলে তার পক্ষে) ওজর খুঁজতেন। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। (তাওবা: ৪৩)
- তিনি তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাকে এব্যাপারে নিষেধ করে দেন। (তাওবা: ৮০)
- তিনি মুমিনদের কষ্টে কষ্ট পেতেন। তাদের প্রতি তিনি ছিলেন ক্ষমাময়, অনুগ্রহশীল। (তাওবা: ১২৮)
- অনেক সময় মানুষ তাঁর ঘরে এসে লম্বা সময় অবস্থান করতো। এতে তিনি হয়তো কষ্ট পেতেন। কিন্তু লজ্জায় কখনও সেটা কারও সামনে প্রকাশ করতে পারতেন না। (আহযাব: ৫৩)
- তিনি ছিলেন সহজ-সরল, মহানুভব, কোমলচিত্ত ও মহাপ্রাণ। সঙ্গীদের সঙ্গে বিনম্র আচরণ করতেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। চরম কঠিন ও সংকটঘন মুহূর্তেও তাদের মতামত গ্রহণ করতেন। (আলে ইমরান: ১৫৯)

পবিত্র কুরআন : ইসলামের চিরন্তন মুজিযা

গোটা পৃথিবীতে সর্বাধিক বিক্রিত, বিতরিত ও পঠিত গ্রন্থগুলোর তালিকার শীর্ষদেশে রয়েছে পবিত্র কুরআন। দেড়শো কোটির অধিক মুসলমান পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস রাখেন। এ কুরআনের পরিচয় কী?

কুরআন মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন এ কুরআন হলো :

- আল্লাহর বাণী। গোটা বিশ্বমানবতার পথ-নির্দেশিকা ও আলো হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।
- কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ।
- কুরআন সবধরনের পবির্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।
- কুরআন পাঠ করলে কিংবা মুখস্থ করলে ইবাদতের সওয়াব হয়। কুরআনের আইন বাস্তবায়নও আল্লাহর ইবাদত।

নবীজী (সা.) এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে কুরআনের অবতরণ শুরু হয়। কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে : 'পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। দীর্ঘ ২৩ বছর বিভিন্ন পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপটের আলোকে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত থাকে।

> কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে: পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে; যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। দীর্ঘ ২৩ বছর বিভিন্ন পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপটের আলোকে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত থাকে।

কুরআনে সর্বমোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে। এসব সূরার বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি ভিন্নভিন্ন। কিন্তু ভাষাগত ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সবগুলো ঐকবদ্ধ প্লাটফর্মে দাঁড়ানো। যার ফলে কুরআনের প্রত্যেকটি সূরা-ই আরবীর সৌন্দর্য ও ভাষা অলংকারের দিক থেকে শীর্ষদেশে অবস্থিত। একইভাবে সবগুলো সূরা-ই মানবতার হেদায়াত ও এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে অভিন্ন কণ্ঠে আহ্বান করে।

কুরআনের কিছু উল্লেখযোগ্য আলোচ্যবিষয় :

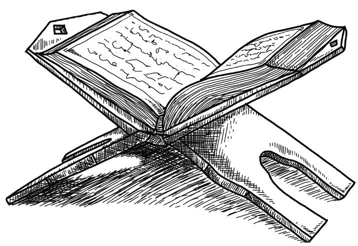

১. আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ ও মুশরিকদের সন্দেহের অপনোদন।

২. নবী-রাসূল ও প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীর ঘটনা বর্ণনা।

৩. আমাদের চারপাশের বিশাল-বিস্তৃত এ মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজীব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর পর্যবেক্ষণ করা। আমাদের ওপর আল্লাহর সমুদয় অনুগ্রহ উপলব্ধির আহ্বান।

৪. ধর্মের বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধসমূহের ব্যাখা।

৫. মুমিনদের চরিত্রগুণ, বৈশিষ্ট্যাবলি ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা। দুষ্ট চরিত্র থেকে সাবধান করা।

৬. শেষ দিবস এবং ভালো-মন্দ সকল মানুষের প্রতিদান নিয়ে আলোচনা।

৭. নবীজী (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনের ঘটনাবলি সুষ্ঠু মূল্যায়নের মাধ্যমে মুমিনদের দীক্ষাদান।

কুরআনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত...

কুরআন সংরক্ষণের অলৌকিকতা :

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'কুরআন' (পঠিত)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে এই গ্রন্থ পঠনের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকবে। আবার বিভিন্ন আয়াতে এর নাম রেখেছেন 'কিতাব' (লিখিত গ্রন্থ)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে এই গ্রন্থ লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকবে। আর এভাবেই পবিত্র কুরআন দুই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়েছে। যখনই নবীজীর ওপর কুরআনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাঁর সামনে সেটা লিখে ফেলা হতো, তাঁর মুখের তেলাওয়াত শুনে সে অনুযায়ী মুখস্থ করা হতো। সে কারণে মুখস্থ কুরআন ও লিখিত কুরআনের মেলবন্ধন জরুরি। ফলে লিখিত কুরআনের সঙ্গে না মিললে হাফেজদের মুখস্থ কুরআন গৃহীত হবে না। আবার রাসূলের মুখে নিঃসৃত ও উম্মাহর মুখস্থ কুরআনের সঙ্গে না মিললে লিখিত কুরআনও গৃহীত হবে না।

খ্রিস্টান পাদরী-পুরোহিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, খ্রিস্টধর্মের ইঞ্জীলগুলোর (সুসমাচার) মাঝে অসংখ্য বৈপরীত্য রয়েছে। আর এ বৈপরীত্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার! কারণ হিসেবে তারা ইঞ্জীল লেখকদের ভিন্ন ভিন্ন তথ্যসূত্রের ব্যবহার, এগুলো রচনার ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং এগুলোতে বিদ্যমান অসরাসরি ওহীর প্রকৃতিকে দায়ী করেন। তাদের মতে, ইঞ্জীলে মানবতার জন্য দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান থাকাই দেখার বিষয়; অন্য কিছু নয়।

ইঞ্জীলের বিপরীতে কুরআনের মাঝে আমরা দেখতে পাই এক ভিন্ন ও বিচিত্র বিস্ময়কর বাস্তবতা। যে কোনো বস্তুনিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, কুরআন সব ধরনের সংঘর্ষ কিংবা বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। কেননা কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহর বাণী। নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু সেভাবেই মুখস্থ ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাতে কোনো কম-বেশ কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়নি। আর এ জন্যই মুসলমানগণ বিভিন্ন মাযহাব, চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির শত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কুরআনের একটি শব্দের ব্যাপারেও কখনও মতভেদ করেননি।

কুরআনের লিখিত রূপ, পাঠ পদ্ধতি ও আত্মস্থকরণ ইত্যাদি সবকিছুই সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা, নিপুণতা, যথার্থতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। আর এভাবেই ইতিহাসের ধাপে ধাপে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এ কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে। একটি অক্ষরও তাতে বাদ পড়েনি। আবার সামান্য একটি ধ্বনিচিহ্নও তাতে অতিরিক্ত ঢুকে পড়েনি। ফলে আজও যদি সুদূর চীন কিংবা আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে কেউ কুরআনের কোনো কপি কিনে দুনিয়ার কোনো প্রাচীন যাদুঘরে সংরক্ষিত কুরআনের হাজার বছরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, তবে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। এক অত্যাশ্চর্য কুরআনী জগত আবিষ্কার করবে। সেই বর্ণ, অক্ষর, সেই বাক্য, সেই পাঠপদ্ধতি, সবকিছু হবহু সেই আগের মতোই। কত যুগের পরিবর্তন হলো, ভাষার বৈচিত্র্য এলো; কিন্তু এই কুরআনে সামান্য ব্যতিক্রম এলো না। আজ থেকে হাজার বছর আগে মক্কা মুকাররমার একজন আলেম যেই কুরআন পড়তেন এবং যেভাবে পড়তেন, আজও ঠিক সেই কুরআন ও সেভাবেই ইন্দোনেশিয়ার এক শিশুর মুখে আপনি শুনতে পাবেন। একারণেই কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'আর এটা যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অসংখ্য বৈপরীত্য দেখতে পেতো।' (নিসা : ৮২)। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, ফলে তাতে বৈপরীত্যের কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আর নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী।' (হিজর : ৯)

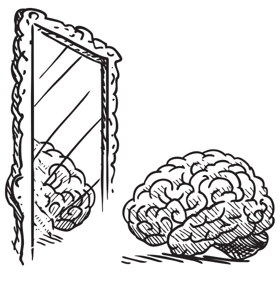

বর্ণনাগত ও মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা:

যে কোনো পাঠক একটু অভিনিবেশসহ কুরআন পাঠ করতে গেলেই বুঝতে পারবেন, এ গ্রন্থ পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। তাকে নিবিড়ভাবে একান্তে সম্বোধন করে। তার সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মুখামুখি বিতর্ক করে। এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো, কুরআন পাঠকের চিন্তার সীমা অতিক্রম করে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে পাঠক কুরআনের কাছে নিজের পরিচয় দেয়ার আগেই কুরআন তাকে পড়ে নেয়।

শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির চোখের দিকে তাকিয়ে একটা মানুষ যখন দেখে সেই চোখ তার পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করছে, তখন সেটা বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায় বটে। কিন্তু একটি গ্রন্থ কোটি মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের মনের ভেতরের সুপ্ত প্রশ্ন উত্থাপনের পূর্বেই জবাব প্রদান করে তখন সে বিস্ময়ের সীমা থাকে কি!

কুরআন যখন এভাবে পারঙ্গমতার সঙ্গ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির কথা খুলে বলে, মানুষের গোপনীয়তার পর্দা তুলে দেয় ও দুর্বলতাগুলো আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে, তখন প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগে বৈকি। কিন্তু আমাদের জেনে রাখতে হবে, কুরআন মানুষকে এভাবে ছোট করে না; বরং সে তো মানুষের মন ও মননকে, হৃদয় ও বিবেককে জাগিয়ে তোলে। জীবনের যেসব জটিল প্রশ্নগুলো মানুষ সবসময় এড়িয়ে চলে, কুরআন এগুলোর জবাব খোঁজে।

আমাদের যখন কেউ কুরআন পাঠ করে, কুরআনে বিধৃত নানান চরিত্রের কিছু মানুষের বর্ণনা ও তাদের জীবনের ঘটনা জানতে থাকে, তাদের চিন্তা- চেতনা, মনন, অনুভূতির সঙ্গে বাস করা শুরু করে, তাদের কারও ভ্রষ্টতা আবার কারও সফলতা ও মুক্তির কাহিনী পড়তে থাকে.... তখন সেও নিজের সঙ্গে সেগুলো মিলাতে থাকে। পুনরায় নিজের জীবনের হিসাব কষে...। এভাবে যতই কুরআনের সেসব আয়াত, সেসব জীবনচিত্র ও উদাহরণের গভীরে যেতে থাকে, নিজের অজান্তেই তার ভেতরে সেগুলো ততোই প্রভাব ফেলতে থাকে। ফলে এক সময় কুরআন তার হৃদয়ের আয়নায় পরিণত হয়। তাতে সে তার নিজের হৃদয় ও মনের প্রকৃত ছবি দেখতে পায়। নিজের সক্ষমতা ও অক্ষমতা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও শংকা, ভালো ও মন্দ দিকগুলো আবিষ্কার করে। এভাবে পাঠকের হৃদয়ের গভীর থেকে একসময় স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বেরিয়ে আসে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' মন্ত্রবাণী।

আশাভঙ্গ আর নৈরাশ্যের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যখন তার মনকে ছেয়ে ফেলে, তখন সে পাঠ করে, 'আপনি বলুন! হে আমার বান্দাগণ তোমরা যারা নিজেদের আত্মার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (যুমার : ৫৩)

যখন সে চরম মনোকষ্ট ও আত্মিক অন্তর্জ্বালায় ভোগে। মানসিক দ্বন্দ্ব-সমুদ্রের অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে এক টুকরা খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। একটু আশ্রয় চায়। তখন সে আল্লাহর এ বাণীর মাঝে আশার আলো দেখে। আশ্রয়ের ঠিকানা পায় : 'আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। (তখন আপনি বলুন) নিশ্চয়ই আমি নিকটেই রয়েছি। আমাকে যখন কেউ ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়। (বাকারা : ১৮৬)

বান্দা যখন নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। জীবনের বোঝা বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ঝড়-তুফানের বিপরীতে পথ চলতে চলতে খেই হারাতে থাকে, তখন সে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ভেতরে লাভ করে সত্যিকার উপশমের, সকল সমস্যা সমাধানের রাস্তা : 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। সে ভালো কিছু করলে সেটার সুফল পাবে। মন্দ কিছু করলে সেটার কুফল ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করে ফেলি, তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ওপর এমন ভার অর্পণ করবেন না, যা আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েন না যেটা বহনের সাধ্য আমাদের নেই। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের পাপ মার্জনা করুন। আমাদের ওপর অনুগ্রহ করুন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (বাক্বারা : ২৮৬)

পশ্চিমা দুনিয়ার সত্যনিষ্ঠ লেখকদের ভেতরে যারা কুরআনের এই যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য ও মানুষের মন-মননে এর প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সভ্যতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উইল ডুর‍্যান্ট। তিনি তার 'সভ্যতার কাহিনী' শীর্ষক গ্রন্থে (১৩/৬৮-৬৯) লেখেন :

উইল ডুরান্ট বলেন,

'অতীতের প্রত্যেকটি যুগে ও আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে বিশাল সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান ও চিন্তাশীল মনীষী কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার স্তর নির্বিশেষে অগণিত-অসংখ্য মানুষ এ কুরআনে বিশ্বাস করেছেন। এসব কিছুর কারণ হলো, কুরআন সর্বজন গৃহীত একটি সুস্পষ্ট ও সত্য আকীদা (বিশ্বাস) নিয়ে এসেছে'।

'অতীতের প্রত্যেকটি যুগে ও আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে বিশাল সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান ও চিন্তাশীল মনীষী কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার স্তর নির্বিশেষে অগণিত-অসংখ্য মানুষ এ কুরআনে বিশ্বাস করেছেন। এসব কিছুর কারণ হলো, কুরআন সর্বজন গৃহীত একটি সুস্পষ্ট ও সত্য আকীদা (বিশ্বাস) নিয়ে এসেছে। সবচেয়ে সহজ, দ্ব্যর্থহীন, বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি ও প্রথা-পার্বণ থেকে দূরে, পৌত্তলিকতা ও পুরোহিততন্ত্র বিমুক্ত একটি বিমল বিশ্বাস। ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে কীভাবে কোনো অনুযোগ ব্যতীতই মানব জীবনের ঝড়-তুফানের মুকাবেলা করতে হবে। কীভাবে বিরতিহীন ও বিরক্তিহীনভাবে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে যেতে হবে। সে মানুষকে দীন (ধর্ম) এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ধর্মের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। এমন বিশুদ্ধ আকীদা নিয়ে এসেছে যে আকীদা থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। 'পূর্ব কিংবা পশ্চিম অভিমুখী হওয়া পুণ্য নয়। পুণ্য তো হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলা, শেষ দিবস, ফিরিশতা, আসমানী গ্রন্থ ও নবীগণে বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, যাচঞাকারী এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করে। আর যারা নামাজ কায়েম করে। যাকাত দান করে। আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন সেটা রক্ষা করে। দুঃখে ও যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্যধারণ করে। তারাই হলো সত্যবাদী। আর তারাই হলো আল্লাহভীরু।' (বাক্বারা : ১৭৭)

কুরআন কোত্থেকে এসেছে?

মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এবং মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই উপর্যুক্ত প্রশ্নটি যুক্তিযুক্তভাবেই পাঠকের মাথায় এসে পড়ে। কেন কুরআনের ব্যাপারে আমরা মুসলমানদের বর্ণনা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য? এ ব্যাপারে কি কিছু প্রশ্ন তুলতে পারি না আমরা?

এ ব্যাপারে পৃথিবীর ইতিহাসবিদদের কোনো মতানৈক্য নেই যে, কুরআন এসেছে লেখা-পড়া-না-জানা এক নিরক্ষর আরবী মানুষের মুখ থেকে। ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীতে যিনি মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। এ গ্রন্থে আমরা আরও সুস্পষ্টভবে পড়ি যে এটা মুহাম্মাদের নিজের রচিত গ্রন্থ নয়; বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র বাণী। মুহাম্মাদের ভূমিকা হলো কেবল সেটা পৌঁছে দেয়া। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতিরেকে মানুষের কাছে সেটা বর্ণনা করা।

এখন দেখার বিষয় এটা কি আসলেই আল্লাহর অবিকৃত বাণী? এমনটা কি সম্ভব নয় যে মুহাম্মাদ নিজে এটা রচনা করেছেন? অথবা তাঁর কাছে আসা আল্লাহর বাণী নিজের মতো করে সাজিয়ে এরপর মানুষের কাছে সেটা পৌঁছিয়েছেন?

> ইসলামের রাসূল যদি তাঁর নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজের বক্তব্যকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়ে থাকেন। তবে তিনি তাঁর সকল বক্তব্যকে কেন আল্লাহর নামে চালিয়ে দিলেন না?

এগুলো বৈধ প্রশ্ন। কুরআন সম্পর্কে জানাশোনা না থাকলে, কুরআনের সনির্বন্ধ পাঠক না হলে, মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন-কাহিনী না জানলে যে কারও মনে এসব প্রশ্ন এসে উঁকিঝুঁকি দিতেই পারে। এখন আমাদের কাজ হলো এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, জগতের অসংখ্য সাহিত্যিক এবং বড় বড় মনীষী তাদের ধী, মেধা, মনীষা ও প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও অন্যের সৃষ্টির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষের মেধার সৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকে চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে অন্যের নামে চালিয়ে দিয়েছেন এমন কি কেউ আছেন? এটা কি যৌক্তিক?

কেউ বলতে পারেন, মুহাম্মাদ তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজের বক্তব্যকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তখন পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে তিনি তাঁর সকল বক্তব্যকে কেন আল্লাহর নামে চালিয়ে দিলেন না? (হাদীস নামে কেন আলাদা তার বক্তব্য সংকলিত হলো?)

একজন মানুষ নিজে একটি গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা পাবার আশায় সেটাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিলেন। এটা যৌক্তিক ও বোধগম্য বিষয়। কিন্তু সেই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় যখন দেখা যায় গ্রন্থকার মুহাম্মাদকে প্রচণ্ডভাবে ভৎর্সনা করছেন, তাকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছেন, শোধরে দিচ্ছেন! তখন এমন কাজকে যৌক্তিক কীভাবে বলা যায়? কেউ নিজের গ্রন্থে নিজের ভুল ভ্রান্তির এমন ফিরিস্তি তুলে ধরেছে কোথায় কবে?

কুরআনের পাঠক মাত্রই জানেন কুরআন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে মুহাম্মাদের সমালোচনা করেছে। ব্যক্তিগত কিংবা উন্মোচিত কোনো বিষয়েই ছাড় দেয়নি। পারিবারিক বিষয়ে তাকে ভৎর্সনা করেছে, দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাঁর রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে ভুল আখ্যা দিয়েছে। উপরন্তু, তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছে!

এবার আমরা এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। একবার এক অন্ধ সাহাবী রাসূলের দরবারে এলেন। তিনি তখন কুরাইশের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু অন্ধ সাহাবী সেটা খেয়াল করতে পারলেন না। তিনি রাসূলের উদ্দেশে বললেন, হে রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন আমাকেও শিখিয়ে দিন। তিনি কয়েকবার কথাটি বললেন এবং একটু জোরাজুরি করলেন। এতে করে রাসূল রাগান্বিত হয়ে পড়লেন। ক্রোধে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়লো। (তিনি চাচ্ছিলেন অন্ধ সাহাবী একটু অপেক্ষা করতেন)। অতঃপর রাসূল তার কথার জবাব না দিয়েই চলে গেলেন। কুরআন মানব

ইতিহাসের এ সময়টিকে চিত্রবন্দি করে ফেললো। ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য গেঁথে দিলো এ ঘটনাটি। সবিস্তারে এবং সূক্ষ্মভাবে ঘটনাটি বিধৃত করলো। কীভাবে মুহাম্মাদ (সা.) অন্ধ সাহাবীর প্রতি ভ্রু কুঁচকালেন এবং তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে থাকলেন। কুরআন শুধু ঘটনা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত রইলো না। ঘটনার পরে মুহাম্মাদ (সা.) কে ভর্ৎসনা করলো। তাঁকে সতর্ক করে দিলো আবার যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়! শুধু তাই নয়; সূরাটিরও এমন একটি নাম দিলো যাতে করে নামটিই সে ঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে থাকে আজীবন। কুরআনের সে সূরাটির নাম হলো 'আবাসা' (অর্থ তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করলেন)। এরপর থেকে যখন সেই অন্ধ সাহাবী রাসূলের কাছে আসতেন তিনি তাঁর তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন, যার জন্য আমার প্রতিপালক আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন তাকে স্বাগতম!

কুরআন রাসূলের এমন কিছু সমালোচনা, ভর্ৎসনা ও দিক-নির্দেশনা সংবলিত ঘটনা বর্ণনা করেছে আমাদের কেউই যেগুলো নিজের ব্যাপারে মানুষের সামনে আনতে চাইবে না। তাহলে কোন্ যুক্তিকে কুরআনকে মুহাম্মাদ রচিত গ্রন্থ বলা হবে? প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি ও প্রসিদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ভুলভ্রান্তিকে কেউ এভাবে ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখে?

উপরন্তু ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য বার আমরা মুহাম্মাদকে দেখতে পাই জীবনের কঠিনতর ও প্রগাঢ় অন্ধকারঘন মুহূর্তে অহীর অপেক্ষা করছেন। তাঁর পয়গামের সত্যতা, মর্যাদা, তাঁর নিজের কিংবা পরিবারের নির্দোষতা ও দায়মুক্তির লক্ষ্যে ওহীর জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছেন... অথচ অহী আসছে না।

একবার তাঁর শত্রুপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় নিজস্ব দুশমনি ও জুলুমে ক্ষান্ত না থেকে অন্য ধর্মের কিছু আলেমদের সহায়তা চাইলো।

তারা তাদেরকে মুহাম্মাদের নিকট তিনটি প্রশ্ন পেশ করার পরামর্শ দিলো। যদি সে ওগুলোর জবাব দিতে পারে তবে তাকে নবী হিসেবে মেনে নেবে। আর যদি জবাব দিতে না পারে তবে সে নবী নয় ধরা হবে। শত্রুপক্ষ পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করলো। তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বললেন, আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেবো..

কিন্তু কিছু দিনের জন্য তাঁর কাছে কোনো ওহী এলো না। তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবও দিতে পারছিলেন না। ফলে শত্রুরা তার প্রতি বিদ্রূপ আর উপহাসের তীর ছুঁড়তে লাগলো। তিনি নিদারুণ অস্থির ও ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়লেন। অবশেষে দীর্ঘ পনেরো দিন পরে তাঁর কাছে ওহী এলো। তাতে তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হলো। পাশাপাশি মুহাম্মাদকে বলে দেয়া হলো : আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরতা ব্যতীত এবং 'ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলা ব্যতীত আগামীকাল আমি অমুক কাজ করবো'- সুনিশ্চিতভাবে এমন কথা কখনও বলো না। এটা শেখানোর জন্যই আল্লাহ বিলম্বে ওহী পাঠিয়েছেন। (কাহাফ : ২৪)

> কুরআন রাসূলের এমন কিছু সমালোচনা, ভর্ৎসনা ও দিক-নির্দেশনা সংবলিত ঘটনা বর্ণনা করেছে আমাদের কেউই যেগুলো নিজের ব্যাপারে মানুষের সামনে আনতে চাইবে না।

কিছু পুরনো অভিযোগ :

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন-কাহিনীই মূলত তার দাবি ও পয়গামের সত্যতার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী প্রমাণ।

এক নিরক্ষর জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে বেড়ে ওটা এক নিরক্ষর মানব। অন্যায়-অপরাধ আর অশ্লীলতা ব্যতীত বাকি সবকিছুতেই যিনি তাদের সকল কর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সহযোগী। তাদের বৈঠকের সঙ্গী। নিজের ও পরিবারের জন্য উপার্জনে ব্যস্ত। কখন ব্যবসায়ী আবার কখনও মেষচারী। জ্ঞানী-বিজ্ঞান কিংবা জ্ঞানীদের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। জীবনের চল্লিশটি বছর এভাবে কাটানোর পরে হঠাৎ সে ব্যক্তিই নিজ সম্প্রদায়কে এমন কথা শুনাতে লাগলেন যা তারা ইতঃপূর্বে কোনোদিন শুনেনি। নিজেদের পূর্বপুরুষদেরও বলতে দেখেনি। তিনি তাদেরকে প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর সবিস্তার বিবরণ দিতে লাগলেন। সৃষ্টির সূচনার ইতিহাস, পূর্বযুগের নবী-রাসূলদের জীবনের বিস্তৃত কাহিনী শুনাতে লাগলেন! জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে লাগলেন!!!

এক বিড়ম্বনাময় বাস্তবতার সঙ্গে ধাক্কা খেলো মুহাম্মাদের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষের লোকজন। এমন বাস্তবতাকে কীভাবে মানবীয় ব্যাখ্যা দেয়া যাবে সেটা নিয়ে তারা অস্থির হয়ে পড়লো। সহজেই মানুষকে গিলানো যাবে এমনসব অপবাদ উদ্ভাবনের জন্য শশব্যস্ত হয়ে পড়লো।

কুরআন মুহাম্মাদের নিজস্ব আবিষ্কার- শক্তভাবে এমন দাবি করা সত্যিই কঠিন। কুরআনের পাঠক ও ভাবুক সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপারটি একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মুহাম্মাদ অন্য কারও থেকে শিখেছেন- এটাও বলা যায় না। কারণ তিনি আমাদের মাঝেই বসবাস করেছেন। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ অবগত....। এসব কারণেই মুহাম্মাদ (সা.) এর দুশমনরা অনিশ্চিত ও অস্থৈর্য ছিল। তারা একেক সময় একেক অপবাদ দিতে লাগলো। কখনও বলতে লাগলো কুরআন মুহাম্মাদ অন্য কারও কাছ থেকে শিখেছে। কখনও বললো এটা তাঁর নিজের

> এটা মূলত জগতের সকল নবী-রাসূলের জীবনের অপরিহার্য ও চির সত্য বাস্তবতা। যখন তাদের দুশমনরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় করাতে পারতো না, তখনই তাদেরকে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি অপবাদ দিতো।

রচনা। আবার কখনও বলছিল এটা তার স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাখ্যা। যখন এসব অপবাদের সপক্ষে তারা উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হলো, তখন স্বেচ্ছাচারমূলক আক্রমণ শুরু করলো। 'যাদুকর', 'কবি', 'পাগল'সহ অসংখ্য অভিধা-বাণে জর্জরিত করতে লাগলো।

নাম ও ব্যক্তি ভিন্ন হলেও এগুলো মূলত একই ধারাবাহিক উপাখ্যানের পর্ববিশেষ। একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। মূসা (আ.) কে কি যাদুকর নামে অপবাদ দেয়া হয়নি? ঈসা (আ.) কে কি উন্মাদ বলা হয়নি?

এটা মূলত জগতের সকল নবী-রাসূলের জীবনের অপরিহার্য ও চির সত্য বাস্তবতা। যখন তাদের দুশমনরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় করাতে পারতো না, তখনই তাদেরকে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি অপবাদ দিতো। জগতের সকল মিথ্যুকের এটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। যখনই সে সংকীর্ণতায় পড়ে, হাতে প্রমাণ না থাকে, তখনই সে এলোমেলো ছুটাছুটি করে। অপবাদের ডালি খুলে বসে নিজের একটু জায়গা তৈরির জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় তার বরাতেই থাকে।

কুরআনকে মুহাম্মাদের প্রতিভার প্রকাশ বলতে বাধা কোথায়?

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের বিবেকের ভেতরে অকল্পনীয় প্রতিভা ও অচিন্ত্যনীয় সৃজনশীলতা দান করেছেন। তাসত্ত্বেও মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ, এর কার্যকরী ক্ষমতা সসীম ও সংরুদ্ধ। এ কারণেই যদিও মানুষের বিবেক একজন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে, মানুষের ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিদানের জন্য পার্থিব জীবনের পরে আরও একটি জীবনের অস্তিত্ব থাকার আবশ্যকতা

অনুভব করে, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও মানবীয় বুদ্ধি সেসব ব্যাপারে সবিস্তারে কিছু বলতে পারে কী? প্রমাণবিহীন রহস্যপূর্ণ এ ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার রাখে কী?

কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে যে কেউ দেখতে পাবে কীভাবে কুরআন আমাদেরকে বিশ্বাসের সীমা-পরিসীমাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কীভাবে সৃষ্টির সূচনা হলো, কীভাবে এর সমাপ্তি ঘটবে, জান্নাত ও জান্নাতের নিয়ামতগুলো কী কী, জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তি কেমন হবে, জাহান্নামের দরজার কয়টি, দরজায় নিযুক্ত ফিরিশতার সংখ্যা কতজন- এসব কিছু বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছে। জগত ও জীবনের বাস্তবতার সুস্পষ্ট ও সবিশদ বর্ণনা দিয়েছে। কেবল বুদ্ধির ওপর ভর করে এসব অদৃশ্য বিষয়ের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া সম্ভব কী?

প্রকৃতপক্ষে মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও বোধশক্তির মাধ্যমে এসব বিষয় জানা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের সামনে কেবল দু'টি পথই খোলা থাকবে। হয়তো এগুলো মিথ্যা, অলীক কল্পনা ও মনগড়া কাহিনী হবে; নয়তো এগুলো হবে এমন শাশ্বত সত্য ও অবিনশ্বর বাস্তবতা- যেগুলো দীক্ষা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানও কুরআনের এসব বাস্তবতার বিরুদ্ধাচারণ করেনি। কুরআন প্রদত্ত কোনো তথ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তথ্য দান করেনি। পাশাপাশি বিভিন্ন অদৃশ্য বিষয়ে প্রাচীন আসমানী গ্রন্থগুলো যেসব তথ্য প্রদান করেছে কুরআন সেগুলোর সঙ্গে মিল-মিছিল বজায় রেখেছে।

কুরআন কি মুহাম্মাদের হাতে পরিমার্জিত বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের সংকলিত রূপ?

তাহলে কুরআন কি প্রাচীন নবী-রাসূলদের গ্রন্থাবলির সারসংকলন? এমনটা কি সম্ভব যে মুহাম্মাদ বিভিন্ন গ্রন্থাবলির নির্যাস দিয়ে কুরআন রচনা করেছেন?

এমন চিন্তাধারা কখনোই শুদ্ধ ও প্রমাণিত হতে পারে না। কারণ যদি আমরা বাদ দিই যে, মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন একজন নিরক্ষর। তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষও ছিল বর্ণজ্ঞানহীন নিরক্ষর। জ্ঞান-বিজ্ঞাসের সঙ্গে তাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল না। শৈশবের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের সঙ্গে তাঁর কোনো ওঠবোস ছিল না। তাছাড়া সেযুগের কিতাবধারী জ্ঞানী লোকজন নিজের পদমর্যাদা ধরে রাখার জন্য জ্ঞান নিয়ে লুকোচুরি করতো। লুকোতো। সকলের জন্য জ্ঞানের দরজা অবাধ ও উন্মুক্ত ছিল না...।

এই সব কিছু যদি আমরা দিয়ে দিই। তারপরেও যে কোনো সত্যনিষ্ঠ গবেষকের কাছে যে বিষয়টি দিবালোকের মতো সুপ্রকট যে, কুরআন সবকিছুতে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের অনুগামী নয়। ঢালাওভাবে সেগুলোর সত্যায়নকারীও নয়; বরং কুরআন সেসব গ্রন্থে বিদ্যমান অসংখ্য মানবীয় বিকৃতির কথা তুলে ধরেছে। অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেছে। সেসব ধর্মের পাদরি-পুরোহিতদের গোপন করা বিষয়গুলো প্রকাশ করেছে। ওসব লোকেরা নবীগণের বিশুদ্ধ ও অনাবিল ধর্মের ভেতরে যেসব বিশ্বাসগত ভ্রান্তি ও নৈতিক বিচ্যুতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, কুরআন সেগুলো অপনোদন করেছে। বস্তুত এমন অজস্র উদাহরণে কুরআন টইটুম্বুর। এরপরেও কীভাবে এমন দাবি করা সঙ্গত যে, মুহাম্মাদ (সা.) তাদের শিষ্য ছিলেন? কুরআনের তথ্যসমূহ তাদের কাছ থেকে ধার করেছেন?

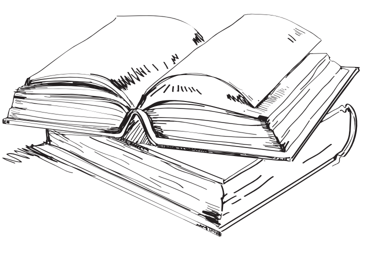

অসামান্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা

সত্যপরায়ণ পাঠক যদি ইতিহাসের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে একটি বিষয় তার ভাবনাতে অবশ্যই আসবে। ইসলামের রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) কি একজন আরবী মানুষ ছিলেন না?

ইতিহাস কি আমাদের বলেনি যে সেকালে তাঁর সম্প্রদায়ের আরবী মানুষগুলোর কাছে গর্ব করার মতো সর্বসাকুল্যে যদি কোনো শাস্ত্র বা কলা থেকে থাকে, সেটা ছিল তাদের বাগ্মিতা, বাকপটুতা ও ভাষা-অলংকার? সৃষ্টি বলতে তাদের কাছে ছিল সাহিত্য ও কবিতা। এগুলো নিয়েই তারা সংঘবদ্ধ হতো, আসর জমাতো, সভা জাঁকাতো। একটি মাত্র কাব্য-ই একটি সম্প্রদায়কে উপরে তুলতো, আবার মাটিতে ফেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলো আমাদের আরও জানাচ্ছে, সে যুগে কোনো একটি গদ্য কিংবা পদ্য বলে সহজে পার পাওয়ার সুযোগ ছিল না। চতুর্দিক থেকে সবাই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো। সমালোচনা করতো। পূর্ণ করতো। খুঁত ধরতো। একই ঢঙয়ে প্রতিবাদ করতো। বস্তুত এটাই ছিল তাদের প্রতিযোগিতার ময়দান। শক্তি-সামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের রমরমা ও জমজমাট মঞ্চ।

ঠিক সেই সময়ে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু-যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যার বিপক্ষে জনগণকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতো না- ময়দানে এসে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো। তাদেরকে বললো এই কুরআনের মতো কিংবা এর ক্ষুদ্র একটি অংশবিশেষের মতো কোনো গ্রন্থ নিয়ে আসতে! কিন্তু তারা সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি। নীরব ও নির্বিকার থেকেছে। ময়দান ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

শত্রুপক্ষের সবচেয়ে সুবিধাজনক ও শক্তির জায়গাটিতে আঘাত হানাটা মোটেই মামুলি ব্যাপার ছিল না। কারণ আশংকা ছিল এতে শত্রুপক্ষ প্রবল রোষ নিয়ে জেগে উঠবে এবং দলে-দলে তার মুকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস পাবে। তার নিয়ে আসা গ্রন্থকে অসার ও মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। মুহাম্মাদ (সা.) চ্যালেঞ্জ দেয়ার আগে কি এসব ভাবেননি?

কিন্তু এখানে যদি আমরা ধরেও নিই যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। ফলে তাদের ব্যাপারে তার এ ধরনের কোনো আশংকা ছিল না। কিন্তু কী করে তিনি কেবল নিজ সম্প্রদায় নয়; কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসা সকল মানুষের জন্য এ চ্যালেঞ্জ উন্মুক্ত রেখে গেলেন? কীভাবে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষ একাট্টা হয়েও কুরআনের মতো পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ কিংবা এর অংশবিশেষও পেশ করতে পারবে না?

এটা নিঃসন্দেহে অসম সাহসের কাজ। হৃদয়ে ভরপুর প্রত্যয় আর টইটুম্বুর নির্ভরতা ছাড়া এমন দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারে না। সেকারণেই এ চ্যালেঞ্জ সত্য ছিল। কুরাইশের কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের পরে পৃথিবীতে যত বড় বড় বাকপটু বাগীশ আর বাগীশ্বর এসেছে কেউ-ই কুরআনের মতো কিংবা এর অংশ-সদৃশ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি। ১৪০০ বছর আগ থেকে শুরু করে আজও এটা চিরসত্য বাস্তবতা। ইতিহাসের পাতায় যখনই কোনো ব্যক্তি এমন আস্পর্ধা দেখাতে গেছে, চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষের হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। সাহিত্যের ময়দানে সমালোচনা ও পরিহাসের শিকার হয়েছে।

সূরা ফাতিহাঃ

এটা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। প্রত্যেক মুসলমান সবসময় তাঁর প্রত্যেক নামাজে এই সূরা পাঠ করে থাকে। নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে এর অর্থ তুলে ধরা হচ্ছেঃ

সূরা ফাতিহার অর্থ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	পরম করুণাময় দাতা-দয়ালু আল্লাহর প্রতি সম্মান ও যথাযথ আদব রেখে তাঁর নামে শুরু করছি
আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন	আমি আল্লাহর তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও যথাযথ সম্মানসহ তাঁর সকল গুণ ও কর্মাবলী, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তিনি গোটা বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। পালনকর্তা। গোটা জগতের পরিচালক। তিনি অনুগ্রহশীল।
আর-রাহমানির রাহীম	তিনি সকল দয়ার আধার। তাঁর কিছু দয়া জগতের সবকিছু বেষ্টনকারী ও সর্বব্যাপী। এমনিভাবে তাঁর কিছু দয়া কেবল তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত।
মালিকি ইয়াও মিদ্দীন	প্রতিদান ও বিচার দিবসের প্রতিপালক
ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন	হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি। আপনার সঙ্গে কোনো ইবাদতে আর কাউকে শরীক করি না। আমাদের সব কিছুতে কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি। কারণ আপনার হাতে সবকিছু। আর কারও হাতে কিছুই নেই।
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম	হে আল্লাহ আপনি আমাদের সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করুন। আপনার সাক্ষাত পর্যন্ত সে পথে অটল-অবিচল রাখুন।
সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম	সেসব লোকের পথ- যাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করে পথ দেখিয়েছেন। সরল পথে যাদের অটল রেখেছেন। নবী-রাসূল ও সৎকর্মশীলদের পথ।
গাইরিল মাগযূব আলাইহিম ওয়ালায-যাল্লীন	যাদের ওপর আপনি অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ; যারা সত্যকে চেনার পরেও সেটার অনুসরণ করেনি। তাদের পথ থেকে আমাদের দূরে রাখুন। আমাদের আরও দূরে রাখুন সেসব লোকের পথ থেকে- যারা অজ্ঞতা ও অলসতাবশত সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।
আমীন	আপনি কবুল করুন

প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব সিদ্ধান্ত উন্মুক্ত

উপরের নাতিদীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে এসে যে কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, কুরআনের ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত উন্মুক্ত। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফল হিসেবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ও বিচিত্র। তবে আরবীভাষী না হলে এক্ষেত্রে সবার আগে আমাদের করণীয় হচেছ কুরআনের একটি উপযুক্ত ও যথাযথ অনুবাদ নির্বাচন করা।

কুরআনেও বলা হয়েছে, কুরআন পড়ে এবং এর মর্মার্থ গভীরভাবে হৃদয় ও মন দিয়ে উপলব্ধির পরে আমরা যেই ইতিবাচক ফলাফলে পৌঁছি সেটাই হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.) এর নবী হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ বলেন, ‘তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে আমি আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। এটা তাদের ওপর তিলাওয়াত করা হয়। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনুগ্রহ ও উপদেশ’। (আনকাবূত : ৫১)

কুরআনে প্রত্যেক মানুষকে এর অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, হৃদয় ও বিবেকের দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে না রাখলে যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এই চিরসত্য অনুধাবন করা সম্ভব। (মুহাম্মাদ : ২৪)

ইসলামের ইবাদতের মর্মকথা কী?

আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী?

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইবাদত ও আমলের মুখাপেক্ষী নন। বাস্তবতা হলো কিছু বাহ্যিক প্রথা-পার্বণ, রীতি-নীতি আর আর্থিক কর আদায়ের মাধ্যমে ইসলামে মুক্তির সনদ পাওয়া যায় না। মুক্তির প্রকৃত পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে সত্যিকার অর্থে ফিরে যাওয়া। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এগুলো মানুষের আত্মার উন্নতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। মানব সেবা ও মানবসমাজের জাগরণীমূলক কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছ থেকে রিযিক চাই না। তারা আমাকে খাওয়াবে সেটাও চাই না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন রিযিকদাতা। মহা শক্তিশালী।' (যারিয়াত : ৫৬-৫৮)

যখন কিছু লোক নামাজের কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো (ইসলামে নামাজের কিবলা হচ্ছে মক্কা শরীফ), তখন তাদের জবাব দেয়া হলো, কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফেরার নামই ইসলাম নয়; বরং দীনের মূল স্পিরিট হচ্ছে সত্যিকার বিশ্বাস, আল্লাহমুখিতা, সৎকর্ম, পরোপকার ও মানবতার কল্যাণে কাজ করা। আল্লাহ বলেন, 'পূর্ব কিংবা পশ্চিম অভিমুখী হওয়া পুণ্য নয়। পুণ্য তো হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলা, শেষ দিবস, ফিরিশতা, আসমানী গ্রন্থ ও নবীগণে বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, যাচঞ্চাকারী এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করে। আর যারা নামাজ কায়েম করে। যাকাত দান করে। আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন সেটা রক্ষা করে। দুঃখে ও যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্যধারণ করে। তারাই হলো সত্যবাদী। আর তারাই হলো খোদাভীরু।' (বাক্বারা : ১৭৭)

তাহলে ইবাদত কিসের জন্য এবং কার জন্য? কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদত ও ধর্ম-কর্ম পালনে তার ব্যক্তিগত লাভ। এর দ্বারা মানুষের নিজের নাজাত ও মুক্তি মিলবে। একইভাবে যদি কেউ অবিশ্বাস করে, আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে একান্তভাবে সে-ই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ কোনোকিছুতেই আমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি বলেন, আর যে ব্যক্তি মেহনত-মুজাহাদা করে, সেটা একান্ত নিজের জন্যই করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা গোটা জগতবাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।' (আনকাবূত : ৬)

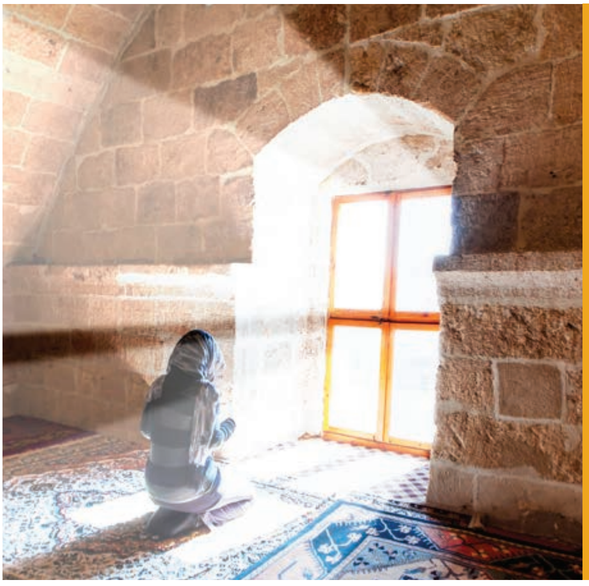

"যখন কিছু লোক নামাজের কিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন তাদের জবাব দেয়া হলো, কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফেরার নামই ইসলাম নয়; বরং দীনের মূল স্পিরিট হচ্ছে সত্যিকার বিশ্বাস, আল্লাহমুখিতা, সৎকর্ম, পরোপকার ও মানবতার কল্যাণে কাজ করা।

ইসলামের ভিত্তিসমূহ

ইসলামে বেশকিছু ইবাদতের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম এগুলো কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। এগুলো ইসলামের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে আমরা এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছি :

পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর দাসত্ব এবং নবীজী (সা.) এর আনুগত্য মেনে নেয়ার ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি দেয়া। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। দেখুন পৃ: ৩০

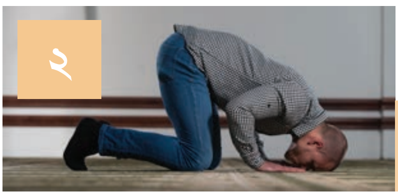

ফরজ নামাযগুলো আদায় করা। দেখুন পৃ: ৯৮

প্রাপ্য ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া। দেখুন পৃ: ১০২

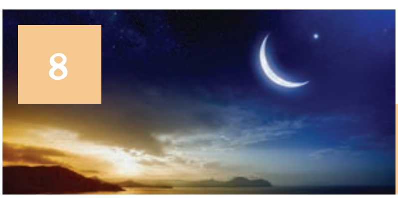

রমজানের রোজা (উপবাস) রাখা। দেখুন পৃ: ১০৪

আর্থিকভাবে সচ্ছল আর শারীরীকভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ (পুণ্যযাত্রা) পালন করা। দেখুন পৃ: ১০৬

ইবাদতের নির্দেশ কেন? কেন এত পরীক্ষা?

কিছু প্রশ্ন হয়তো এখনও কিছু পাঠকের মনে খচখচ করতে থাকবে। কেউ বলতে পারেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের খাওয়ার জন্য মুখ দিয়েছেন, পেট দিয়েছেন। এরপর কেন আবার রোজার (উপবাস থাকার) নির্দেশ দিয়েছেন? কেউ বলবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সৌন্দর্য দিয়েছেন, কামবাসনা দিয়েছেন। এসব দিয়ে আবার দৃষ্টি অবনত থাকতে, নিজেকে ধরে রাখতে বলেছেন কেন? কেউ আরও সামনে বেড়ে বলবেন, আল্লাহ আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন। এরপর আবার অন্যদের ওপর আক্রমণ করতে বারণ করার অর্থ কী?

বস্তুত ইসলামে এসব ব্যাপার খুবই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য; নিজেরা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নয়। উদাহরণত আমাদের কারও কাছে একটি ঘোড়া আছে। আমরা সেটার পিঠে চড়ি, সেটাকে যেদিকে মনে চায় সেদিকে নিয়ে যাই। ঘোড়া আমাদের পিঠে চড়ে না, আমাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে না। একইভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের শরীর দিয়েছেন এবং সে শরীরে শক্তি দিয়েছেন। এটাও ঘোড়ার মতো। উদ্দেশ্য হলো যাতে আমরা এতে আরোহণ করি, নিয়ন্ত্রণ করি। সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে একে ব্যবহার করি।

সুতরাং মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত ও প্রমাণিত হবে কামবাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ, রিপু দমন ও ক্ষুধা সংযত রাখার মাধ্যমে। আত্মার ওপর কৃর্তত্ব করার ভেতর দিয়ে। শরীরের শক্তি কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে। এখানেই মানুষের মহত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। এখানেই রয়েছে তার জন্য পরীক্ষা। আর এ জন্যই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে বীর্যের এক মিশ্রণ থেকে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে পরীক্ষা করবো। আর সে কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণক্ষম, দৃষ্টিবান। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। হয়তো সে কৃতজ্ঞ হবে নয়তো হবে অকৃতজ্ঞ'। (ইনসান : ২-৩)

মানব জীবনে যেসব সংকট ও দুর্বিপাক আসে, সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আমাদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও বিশ্বাসগত উৎকর্ষের জন্য আল্লাহ আমাদের এসব পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যাতে করে আমরা জীবন ও জগত নিয়ে আমাদের চিন্তা পুনর্বিন্যস্ত করি, আমাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করি, আমাদের হিসাবগুলো মিলিয়ে নিই। কুরআনে এসেছে, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং তোমাদের জান-মালের সংকোচনের মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। আর ধৈর্যশীলদের আপনি সুসংবাদ দান করুন। যাদের যখন কোনো মুসীবত তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনশীল।' (বাক্বারা : ১৫৫)

এভাবেই পার্থিব জীবন মানুষের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি-অবনতি, উৎকর্ষ-অধোগতির উন্মুক্ত মঞ্চ। যদিও আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদের সুপথপ্রাপ্তি ও দিকনির্দেশনার জন্য অসংখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুতে আমাদের বাধ্য করেননি; বরং আমাদের জন্য পরীক্ষার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। আমাদেরকে পৃথিবীর বিনির্মাণ ও মানবতার কল্যাণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন এবং ইতিবাচকভাবে গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। যখনই ভুল হবে; সেটাকে শোধরে, অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে বলেছেন। নবীজী (সা.) বলেছেন, 'যদি তোমরা পাপ না করতে, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উঠিয়ে নিতেন। তোমাদের জায়গায় এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসতেন, যারা পাপ করবে। এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন'। (মুসলিম : ২৭৪৯)

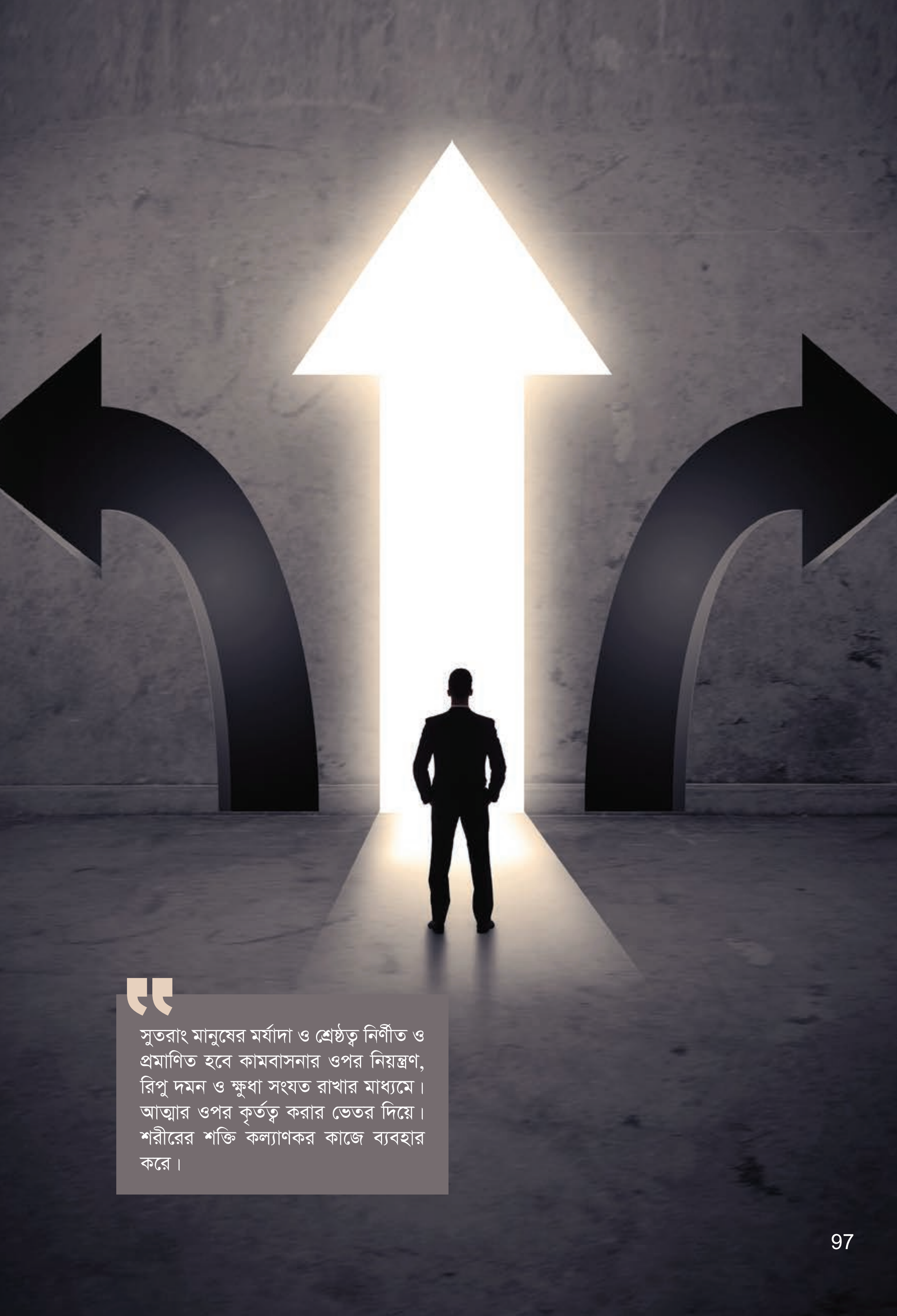

"সুতরাং মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত ও প্রমাণিত হবে কামবাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ, রিপু দমন ও ক্ষুধা সংযত রাখার মাধ্যমে। আত্মার ওপর কর্তৃত্ব করার ভেতর দিয়ে। শরীরের শক্তি কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে।

নামাজ

সচক্ষে কিংবা মিডিয়াতে যদি কোনোদিন আপনি এক অভিমুখী এক কাতারে দণ্ডায়মান সারিবদ্ধ মুসলমানদের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে থাকেন, যেখানে মুসলিমরা মাথা নুইয়ে রুকূ করছেন, সিজদা করছেন, জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজের অস্তিত্ব থেকে অবলুপ্ত হয়ে এক অপার্থিব জগতে লীন হয়ে গেছেন, নিজেকে হয়তো সেদিন জিজ্ঞাসা করে থাকবেন– এটা কেমন ইবাদত?

মুসলমানদের নামাজের পরিচয় কী?

ইসলামের নামাজের রয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য। কেননা এটা আল্লাহর সান্নিধ্য, তাঁর নিকট প্রার্থনা ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কুরআনে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'আর আপনি সিজদা করুন। (আপনার রবের) নিকটবর্তী হোন'। (আলাক : ১৯) আর এ কারণেই ইসলামের সাক্ষ্য দেয়ার পরে ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নামাজ আদায় করা। এটা ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি।

নবীজী (সা.) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল– এ সাক্ষ্য দেয়া, নামাজ আদায় করা..'। (বুখারী : ৮)

ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছে, নামাযী ব্যক্তির মননের পরিচ্ছন্নতা, হৃদয়ের নির্মলতা, অনুভব-উপলব্ধির উপস্থিতি, ভাবের আবেশ ও ধ্যানের নিমগ্নতা, আল্লাহর কাছে সত্যিকার কাতরতা ও সান্নিধ্য বোধের ওপর ভিত্তি করেই নামাজের বিনিময় পেয়ে থাকে। এগুলো নামাযী ব্যক্তিকে আত্মিক প্রশান্তি ও সুখানুভূতি দান করে। আর সেকারণেই নামাজ ছিল নবীজী (সা.) এর অপার সুখের খনি।

এ কারণেই কুরআন আমাদের নামাজ 'আদায়' নয়; 'কায়েম' করার কথা বলেছে। নামাজ 'কায়েম' করার অর্থ হলো, মন-মগজ ও আত্মাসহ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্মিলনে নামাজ পড়া। আর এটা করতে পারলে তখন সেই নামাজ হয়ে থাকে কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক এবং অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজের প্রতিবন্ধক। বস্তুত আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সমীপে শরণ- মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কর্ম।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনার ওপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সেটা আপনি পাঠ করুন। আর আপনি নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় বিষয়। তোমরা যা করো আল্লাহ সেসব জানেন। (আনকাবূত : ৪৫)

যদি কেউ নামাজকে কেবল শরীর-চর্চা, ব্যায়াম ও অঙ্গচালনা মনে করে থাকে, নামাজের আগের পবিত্রতা অর্জনকে নিছক গোসল ও পরিচ্ছন্নতা হিসেবে দেখে থাকে, তবে সে নামাজের মূল স্পিরিটকেই বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ নামাজে যেসব প্রত্যক্ষ শারীরীক কাজ রয়েছে, সেগুলো মূলত পরোক্ষ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি। মুসল্লী যখন হাত তুলে নামাজ শুরু করে তখন সে মুখে বলে 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়'। এরপর যখন রুকূতে ঝুঁকে যায়, তখন বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর ক্ষমতা ও নিজের দুর্বলতার সম্পূর্ণ সজাগ অনুভূতি নিয়ে বলে, 'আমার সুমহান প্রতিপালক পবিত্র'। অতঃপর যখন সিজদায় পড়ে যায়, তখন আল্লাহর সান্নিধ্য ও তার প্রার্থনার মঞ্জুরি কামনা করে, মাটিতে নিজের কপাল ও নাক রেখে নিজের প্রভুর বড়ত্ব ঘোষণা করে বলে, 'আমার সুমহান প্রতিপালক পবিত্র'। তার কাছে দুআ করে। নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলে। আর এভাবেই ইসলামে নামাজ কেবল কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার নাম নয়; নামাজ কিছু সমৃদ্ধ মুহূর্তের নাম, যখন মুমিন বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়। তাঁর কাছ থেকে নিজের অস্তিত্ব ও সৌভাগ্যের আলো কুড়ায়।

> নামাজ ছিল নবীজী সা. এর অপার সুখের খনি।

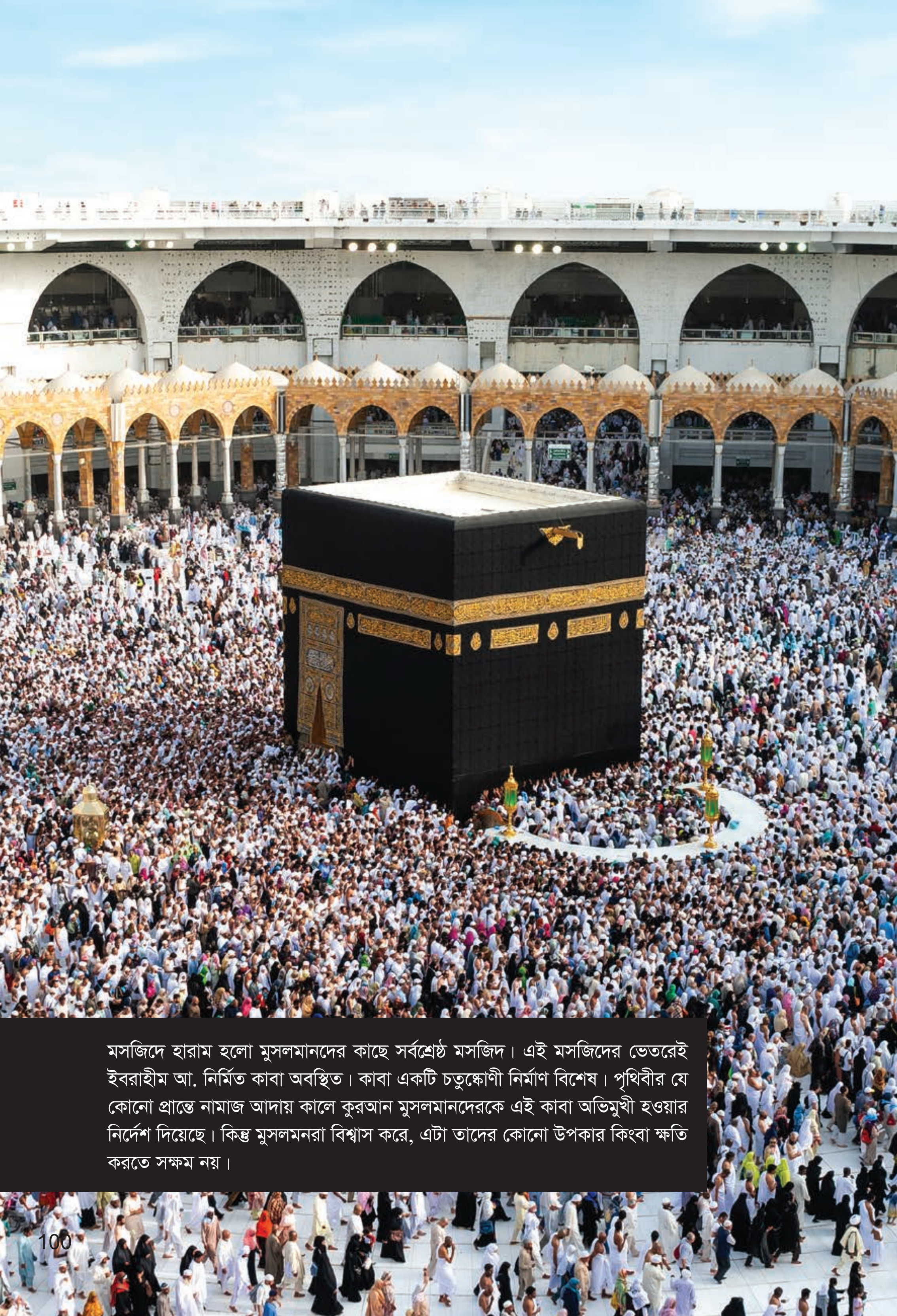

মসজিদে হারাম হলো মুসলমানদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। এই মসজিদের ভেতরেই ইবরাহীম আ. নির্মিত কাবা অবস্থিত। কাবা একটি চতুষ্কোণী নির্মাণ বিশেষ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নামাজ আদায় কালে কুরআন মুসলমানদেরকে এই কাবা অভিমুখী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মুসলমনরা বিশ্বাস করে, এটা তাদের কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ্ তাআলা দিন ও রাতে মুলমানদের ওপর পাঁচ বার নামাজ ফরজ করেছেন। যদিও এ নামাজ সর্বত্র আদায় করা যায়; কিন্তু ইসলাম মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য উৎসাহিত করেছে। যাতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, তাদের বন্ধন গাঢ় হয়। পার্থিব ও অপার্থিব ব্যাপারে তারা একে অন্যের সহযোগী হয়।

ফরজ (অবশ্যপালনীয়) নামাজের পাশাপাশি ইসলাম মুসলমানদের নফল (অতিরিক্ত) নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। যখনই সম্ভব হয় তখনই এসব নামাজ পড়া যায়।

মুসলমানরা কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। কাবা হলো চারকোণা একটি ঘর। সর্বপ্রথম এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন নবীদের জনক হিসেবে পরিচিত ইবরাহীম (আ.)। এটা আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে মক্কা শহরে অবস্থিত। যুগে যুগে নবীরা এ ঘরের দিকে পুণ্যযাত্রা করেছেন। মুসলমানরা খুব ভালো করে জানেন যে কাবা ঘরটি পাথর নির্মিত। এটা মানুষের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুই করতে পারে না। কিন্তু গোটা বিশ্ব মুসলিমকে একমুখী করার জন্য ঐক্যের একটা প্লাটফরম হিসেবে আল্লাহ্ এদিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজান :

মুসলমানদেরকে নামাজের সময় সম্পর্কে অবহিত করতে এবং নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে ডাকতে যেই আহ্বান করা হয়, সেটাকে বলা হয় 'আজান'।

আজান মূলত আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বিশেষ। এবং মুসলমানদেরকে নামাজের জন্য প্রস্তুতকরণ। আজানের বাক্যগুলো হচ্ছে :

১. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে মহান)। (৪ বার)

২. আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই)। (২ বার)

৩. আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল)। (২ বার)

৪. হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ' (এসো নামাজের দিকে)। (২ বার)

৫. হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (এসো কল্যাণের দিকে)। (২বার)

৬. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে মহান)। (২ বার)

৭. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই)।

জাকাত

এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই যে, অতি ধনাঢ্যতা আর অতি দারিদ্র্যতার মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি। সমাজের ধনী ও গরীব শ্রেণীর মাঝে দূরত্ব ও ব্যবধান যতই বাড়বে, ততই সমাজে বিশৃঙ্খলা, অপরাধ বাড়বে। অধঃপতনে নেমে আসবে। ধনী-গরীবের এই দূরত্ব বিমোচনের জন্য পৃথিবীতে অসখ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, চিন্তা ও দর্শন, নীতি ও আইনের জন্ম হয়েছে। এবার দেখার বিষয় ইসলাম এটা কীভাবে নিয়েছে? এ সমস্যা সমাধানের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

ইসলাম ধনী ও সমৃদ্ধ মুসলিমদের ওপর জাকাত ফরজ করেছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্রের বাইরে উদ্বৃত্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ ধনীরা দরিদ্রদের দিবে। অভাব-অনটনের শিকার ফকীর-মিসকীনের মাঝে বিতরণ করবে। এটা ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি।

ইসলামের দৃষ্টিতে জাকাত ধনীদের পক্ষ থেকে গরীবদের ওপর কোনো দয়া বা অনুকম্পা নয়; বরং এটা ধনীর সম্পদে গরীবের হক এবং পাওনা। কোনো ধরনের যাচঞা কিংবা অবমূল্যায়ন ব্যতীতই গরীবদের এ পাওনা সম্পদশালীদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

এটা হলো ধনীদের সম্পদে গরীবদের সর্বনিম্ন ও অপরিহার্য অংশ। এর বাইরে দানের দরজা সতত উন্মুক্ত। গরীবকে যত ইচ্ছা দান করা যাবে। বরং তাদের দান করার মধ্য দিয়েই একজন সম্পদশালী তার জীবনে পাবেন সুস্থতা, সমৃদ্ধি, প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যের ঠিকানা। পরকালে পাবেন এর দ্বিগুণ বিনিময় ও প্রতিদান।

পবিত্র কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে সম্পদ ব্যয় করা হলো একটি শস্যদানার মতো। যেটা বপন করার পরে সাতটি শীষ বের হলো। প্রত্যেকটি শীষে রয়েছে একশ'টি করে দানা। আর এভাবে একটি দানা পরিণত হলো সাতশ' দানাতে। এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ যাকে চান, তার নিয়তের বদৌলতে আরও সমৃদ্ধি দান করেন। 'যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণত হলো একটি দানার মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করলো। প্রত্যেক শীষে রয়েছে এক শ'টি দানা। আর আল্লাহ যার জন্য চান দ্বিগুণ করে দেন। আল্লাহ সুমহান, সর্বজ্ঞ। (বাকারা : ২৬১)

কুরআন আমাদের আরও জানাচ্ছে, অভাবী মানুষের জন্য সম্পদ ব্যয় করা মূলত আত্মার পরিশুদ্ধি ও মনের পবিত্রতার কারণ। কুরআন রাসূলের উদ্দেশে বলছে, 'আপনি তাদের সম্পদ থেকে জাকাত উসূল করুন। যাতে করে তাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পারেন'। (তাওবা : ১০৩)

কুরআন আমাদেরকে আরও জানাচ্ছে, যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, দান থেকে বিরত থাকে, দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে চরম দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

কুরআনে এসেছে, 'তোমরা তো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ কৃপণতা করে। আর যে কৃপণতা করলো, সে নিজের সঙ্গেই কৃপণতা করলো। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন ধনী। আর তোমরা হলে দরিদ্র। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তোমাদের জায়গা অন্য এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, অতঃপর যারা তোমাদের মতো হবে না।' (মুহাম্মাদ : ৩৮)

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি 'জাকাত' সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়। এটার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ঘটলে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হয়। সমাজের দ্বন্দ্বরত ও যুধ্যমান শ্রেণীগুলোর মাঝে সমন্বয় ঘটে। প্রকৃত হকদারদের কাছে নিয়মিত ও সুস্পষ্টভাবে জাকাত বিতরণের ফলে সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর কাছে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ থাকে না। আর সে কারণেই মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাসে বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, জাকাত ও সহায়তার অর্থ নিয়ে ধনীরা সমাজে ঘুরছেন, অথচ সেটা গ্রহণ করার মতো কোনো অভাবী সমাজে নেই!'

অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পাশাপাশি জাকাতের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মানুষে মানুষের ভালোবাসা ও মমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ স্বভাবগতভাবেই মানুষ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, ঋণ অনুভব করে। আর এভাবেই যখন ধনী শ্রেণী গরীব শ্রেণীর প্রতি মমতা দেখায়, তখন গোটা সমাজ সুশৃঙ্খল অবকাঠামোতে পরিণত হয়। সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি বহুলাংশে হ্রাস পায়।

> কুরআন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয়কে উপমা দিয়েছে শস্যদানার সঙ্গে। যেটা বপন করার পরে সাতটি শীষ বের হয়। প্রত্যেকটি শীষে থাকে এক শ'টি করে দানা। আর এভাবে একটি দানা পরিণত হয় সাত শ' দানাতে।

রোজা

শারীরীক সুস্থতা, ওজন নিয়ন্ত্রণ কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শে আমাদের কেউ যখন খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট কিছু খাদ্য পরিত্যাগ করতে পারে, তখন সেটাকে বিশাল সফলতা হিসেবে দেখা হয়। মানুষ তাকে সফল ও শক্তিমান মনে করে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

একজন মুসলমান যখন রোজা রাখে, তখন সে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে সম্পাদিত করে। এটা তার নিজের জন্য একটা শারীরীক প্রশিক্ষণ। নিজের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের দীক্ষা। সর্বোপরি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নির্দেশ পালনের নির্দশন।

রোজা ইসলামের চতুর্থ ভিত্তি। সুতরাং ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাস রমজানের দিনের বেলা সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব রকমের খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে রোজা। এটা প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য ওয়াজিব ।

> ইসলামের নবী সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, রোজা রাখার পরেও যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারলো না, আল্লাহর ঐ ব্যক্তির খানা-পিনা বর্জনের প্রয়োজন নেই।

কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে, রোজা কেবল এ উম্মাহ নয়; বরং পৃথিবীর অনেক পূর্ববর্তী উম্মাহর ওপর রোজা ফরজ ছিল। সেকালের রোজার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। আর তা হলো : আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন ও আল্লাহভীরুতা অর্জন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো।' (বাক্বারা : ১৮৩)

একজন মুসলিম যখন বছরের অল্প কয়েকটি দিনে হাতে গনা কিছু সময় নিজের কাম-বাসনা ও চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তখন সে মূলত নিজের অধিপতি হয়ে যায়। নিজের ওপর কর্তৃত্ব তৈরি করতে পারে এবং বাকি জীবন নিজেকে অন্যায় বাসনা থেকে বিরত রাখতে পারে। আর এ কারণেই নবীজী বলেছেন, যে ব্যক্তি রোজা রাখার পরেও তার জীবনে কেনো পরিবর্তন এলো না, তাঁর চরিত্র সুন্দর হলো না, তবে সে রোজা থেকে কিছুই পেলো না। নবীজী বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারলো না, ওই ব্যক্তির পানাহার বর্জন করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (বুখারী : ১৮০৪)

> কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে, রোজা কেবল এ উম্মাহ নয়; বরং পৃথিবীর অনেক পূর্ববর্তী উম্মাহর ওপর রোজা ফরজ ছিল। সেকালের রোজার পদ্ধতি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। আর তা হলো : আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন ও আল্লাহভীরুতা অর্জন।

পাশাপাশি রোজা রোজাদারের ভেতরে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহায়তার মনোভাব তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয়ে ক্ষুধা-পিপাসায় ভোগে। রোজাদার ইচ্ছা করে ভুগলেও তাদের কষ্টের পরিমাণটা ঠিকই কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারে।

> ইসলাম মুসলমানদের ওপর রোজা ফরজ করেছে। যাতে করে তারা দরিদ্রের ক্ষুধার জ্বালা ও খাবারের প্রয়োজনের কথা অনুভব করতে পারে।

হজ্জ

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মেই নির্দিষ্ট কিছু পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। এসব ধর্মের অনুসারীরা সেসব স্থানে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা আরাধনায় নিরত থাকেন। কিন্তু ইসলামের তীর্থযাত্রা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থযাত্রা। ইসলামের পরিভাষায় এটা হজ্জ নামে পরিচিত। প্রতিবছর ত্রিশ লক্ষাধিক মুসলিম এ তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে মক্কার ছোট্ট ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হন।

ইসলামের হজ্জের রূপরেখা :

হজ্জ ইসলামের চতুর্থ ভিত্তি। শারীরীকভাবে সক্ষম ও আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার হজ্জ পালন করা অপরিহার্য।

এটা মানব জগতের এক বিস্ময়কর তীর্থযাত্রা। মানব-মিলনের এক মহা কেন্দ্রবিন্দু। এখানে এসে জগতের সব জাত-পাত, আশরাফ-আতরাফ, গোষ্ঠি-সম্প্রদায়, রঙ-বর্ণ, ধনী-গরীব, সাদা-কালো এক অভিন্ন পরিচয়ে লীন হয়ে যায়। সকলেই এক পোশাকে, এক রঙে, এক সুরে, একই কণ্ঠে, একই কথায় মেতে ওঠে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, মনিব ও দাসের মাঝের পরিচয় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা, ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাক। এ ঘোষণার তাৎপর্য হচ্ছে: হে আল্লাহ! আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার দরবারে এসেছি আর আমাদের কণ্ঠ ঘোষণা দিচ্ছে, আমাদের অন্তকরণ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, একমাত্র আপনিই হলেন উপাসনার উপযুক্ত; অন্য কেউ নয়। একমাত্র আপনিই হলেন সকল প্রশংসার অধিকারী। আপনি সৃষ্টিকর্তা, নিয়ামতদাতা, আপনি বাদশাহ-নামদার। আপনার কোনো অংশীদার নেই।

সুতরাং হজ্জ হলো একজন মুসলিমের বিভিন্ন অবস্থা, কর্ম-তৎপরতা আর সাক্ষ্য ও ঘোষণার সমন্বয়ে প্রস্তুত এক ঈমানী পুণ্যযাত্রার নাম। এসবের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহভীতি অর্জন করা। তাঁর প্রতি নিজের অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। তাঁর কাছে উত্তম বিনিময় ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'বাইতুল্লাহর চারপাশে প্রদক্ষিণ আর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ (আসা-যাওয়া) করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। (ইবনে আবী শাইবা : ১৫৩৩৪)

মক্কায় হজ্জ আদায় করতে গেলে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজের স্বাভাবিক জামা কাপড়ের পরিবর্তে দুই টুকরো সাদার কাপড় পরিধান করতে হয়। এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং সকল মানুষের সমতার ঘোষণা দেয়া হয়।

ইসলামে পরিবার

বর্তমান

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের কাছে পরিবার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, কয়েকজন মানুষ একটি ঘরে বসবাস করবে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে সেই ঘরের চাবি থাকবে!

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে অনেক মানুষই নিজের পরিবারের প্রতি, নিজের স্ত্রী-সন্তানের প্রতি যেসব দায়িত্ব আছে সেগুলো থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তাদের ভাবনা হচ্ছে, ওসব দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও জীবনটাকে উপভোগ করতে বাধা কোথায়? বাধা যেহেতু নেই, তাহলে অযথা সেসব দায়িত্ব পালনের স্বার্থকতা কোথায়?

ইদানীং এসব ভাবনা প্রকট হলে দাঁড়ালেও মানব সমাজে কিন্তু এগুলো কিন্তু আনকোরা নয়। সভ্যতার শুরু থেকেই কিছু মানুষের অন্তরে এসব ভাবনা এসেছে। ব্যক্তি ও সমাজের ওপর এমন ভাবনার পরিণতি কি সেটা যদি বাদ দেয়াও হয়, তবুও অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে এগুলো নিতান্তই ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা ও কদর্য আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার ফসল।

এ কারণেই ইসলাম পরিবারের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ করেছে। পরিবারের গঠন, শৃঙ্খলা, অধিকার ও পরিবারের সদস্যের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের ওপর জোর দিয়েছে। ইসলাম মনে করে, ঘর ও পরিবার হচ্ছে মানুষের সচেতনতা, দীক্ষা ও জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু। সে কারণে পরিবারের সুস্থ বিনির্মাণ, কর্তব্য সম্পাদন ও সংশোধনের মধ্যে রয়েছে গোটা সমাজের সংশোধন।

ইসলামের অসংখ্য বিধি-বিধানের মাঝে পরিবারের প্রতি সীমাহীন গুরুত্বারোপ ফুটে ওঠে। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি :

১

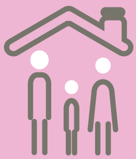

ইসলাম বিবাহ ও পরিবার গঠনে জোর দিয়েছে :

- ইসলাম বিবাহ ও পরিবার গঠনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ ও নবী-রাসূলদের সুন্নাত (রীতি) সাব্যস্ত করেছে। একবার রাসূলের (সা.) কিছু সাহাবী বিয়ে-শাদী ছেড়ে দিয়ে নামাজ-রোজা ও ইবাদতের মাঝে সদা-নিমগ্ন হয়ে থাকার কথা জানালেন। তখন নবীজী তাদের চিন্তাধারার বিরোধিতা করে বললেন, 'কিন্তু আমি রোজা রাখি, আবার খাওয়া-দাওয়াও করি। নামাজ পড়ি আবার বিশ্রামও নিই। আর আমি বিয়ে-শাদী ও সংসার করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (রীতি) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (বুখারী : ৪৭৭৬)
- কুরআন যখন আদম সন্তানের ওপর আল্লাহর দয়া, অনুকম্পা ও নির্দশনাবলির আলোচনা করেছে, তখন উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের গভীর সম্পর্ক, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ, প্রীতি ও অনুরাগের কথা তুলে ধরেছে। কুরআন বলেছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির একটি হচ্ছে, তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছে। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে তৈরি করে দিয়েছেন ভালোবাসা ও অনুগ্রহ।' (রূম : ২১)
- ইসলাম বিয়ে-শাদী যথাসম্ভব সহজ করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি বিবাহে-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। নবীজী (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন। তাদের একজন হচ্ছেন যিনি পবিত্রতা ও নির্মলতার উদ্দেশ্যে বিয়ে করেন।' (তিরমিযী : ১৬৫৫)
- ইসলাম যুবকদেরকে যৌবনের বসন্ত-পর্বেই বিয়ে সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে করে তাদের আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ হয়। পাশাপাশি তাদের শারীরীক কাম-বাসনার বৈধ সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়।

> কুরআন যখন আদম সন্তানের ওপর আল্লাহর দয়া, অনুকম্পা ও নির্দশনাবলীর আলোচনা করেছে, তখন উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের গভীর সম্পর্ক, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ, প্রীতি ও অনুরাগের কথা সবার আগে তুলে ধরেছে।

২

ইসলাম পরিবারের নারী-পুরুষ প্রত্যেক সদস্যকে পূর্ণ সম্মান দিয়েছে :

ইসলাম সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। রাসল (সা.) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাদের দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে তার অনুগতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বীমার ঘরে দায়িত্বশীল। সুতরাং তাকে তার অনুগতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। ঘরের পরিচারক মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী : ৮৫৩)

৩

ইসলাম সন্তানদের ভেতরে মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করেছে। মৃত্যু পর্যন্ত তাদের প্রতি যত্নবান ও অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়েছে :

ছেলে-মেয়ে যতই বড় হোক, আজীবন তার জন্য পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। ইসলাম পিতা-মাতার সম্মানকে আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কোনো ধরনের কথা কিংবা কাজে তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন থেকে বারণ করেছে। এমনকি তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা বিরক্তির সুরে টুঁ শব্দ উচ্চারণ নিষেধ করেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, 'আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করো। আর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তখন তাদের জন্য উফ শব্দটি পর্যন্ত বলো না। তাদের ধমক দিও না। আর তাদের সঙ্গে উত্তম কথা বলো।' (ইসরা : ২৩)

> ইসলাম কোনো ধরনের কথা কিংবা কাজে মাতাপিতার প্রতি সীমালঙ্ঘন থেকে বারণ করেছে। এমনকি তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা বিরক্তির সুরে টুঁ শব্দ উচ্চারণ করতেও নিষেধ করেছে।

৪

সন্তান-সন্ততির অধিকার সুরক্ষা ও তাদের মাঝে ইনসাফের অপরিহার্যতা ঘোষণা করেছে :

রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘পরিবারের সদস্যদের (যাদের দেখভাল করা অপরিহার্য) অধিকার নষ্ট করা পাপের জন্য যথেষ্ট। (আবু দাউদ : ১৬৯২) নবীজী (সা.) আলাদা করে মেয়েদের তত্ত্বাবধানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো মেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পেলো এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করলো, তারা পরকালে তার জন্য জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা-বর্ম হবে’। (বুখারী : ৫৬৪৯)

৫

মুসলিমের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যাবশ্যক :

অন্য কথায়, ইসলাম বাবা ও মায়ের দিকের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তাদের প্রতি সদাচরণ করাকে অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। এটাকে বড় ধরনের পুণ্যের কাজ ও আনুগত্য হিসেবে গণ্য করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সতর্ক করেছে। আত্মীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে এবং সেটাকে কবীরা গোনাহ (গুরুতর পাপ) হিসেবে গণ্য করেছে। নবীজী (সা.) বলেন, ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না’। (মুসলিম : ২৫৫৬)

ইসলামে নারীর মর্যাদা

টেলিভিশনের পর্দায় বিজ্ঞাপন, রাস্তার চারপাশে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বিলবোর্ড কিংবা পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিনগুলোর প্রচ্ছদে দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা নারী জাতির প্রতি কত বড় অন্যায় আর অবিচার করেছে। এই সভ্যতা নারীকে নিছক পুতুল, পণ্য কিংবা ভোগের বস্তু হিসেবে দেখেছে, যার জীবনে বেঁচে থাকার মানেই হলো পুরুষের কামের আগুন নেভানো। কল্পনার পাখায় ভর করে তাকে সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নের আকাশে ঘুরে বেড়ানো।

বাহ্যত একটু কম কদর্য হলেও আদতে এটা সেই প্রাচীন বর্বর সভ্যতারই পুনরাবৃত্তি বিশেষ। সেই সভ্যতায় নারীকে অমর্যাদা করা হতো। পণ্য বানিয়ে বাজারে তার বেচাকেনা হতো। এখনও কার্যত তেমনি হচ্ছে।

অথচ যুগের পর যুগ চরম নিপীড়ন আর জুলুম-বঞ্চনার শিকার নারীর এমন পরিণতি কখনোই কাম্য ছিল না। ইতিহাসের ধাপে ধাপে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রামের পরে নারী জাতি সেই আগের জায়গাতে কখনোই ফিরে যেতে চায়নি।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এমনি এক তিমিরঘন সময়ে পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল। এটা ছিল নারী জাতির ওপর জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ বিদ্রোহ। ইসলাম নারী জাতির চিরমুক্তির শাশ্বত ঘোষণা দিলো। নারীর অধিকার সুরক্ষা, তার মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য অসংখ্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করলো। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে নারী জাতি এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে সসম্মানে বাঁচতে পারে। তার জীবন পরিপূর্ণ অর্থবহ ও ফলপ্রদ হয়ে ওঠে।

একারণে কুরআনের একটি সূরাতে নারীর বিধি-বিধান এতটা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে যে সে সূরাটির নাম দেয়া হয়েছে 'নিসা' তথা নারী। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা কুরআনে বেশ কয়েকজন সৎকর্মশীল নারীর আলোচনা করেছেন। উপরন্তু কুরআনের আরও একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে আরেকজন নারী তথা ঈসা (আ.) এর মাতা 'মারইয়াম' (আ.) এর নামে।

সুতরাং ইসলাম পৃথিবীতে নারীর ব্যাপারে নতুন পয়গাম ও নতুন পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। ইসলাম নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিতে এসেছে। ইসলাম বলে দিয়েছে, নারী পণ্য নয়; নারী হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ। নারী রাতের শয্যাসঙ্গীনী নয়; জীবন-সঙ্গীনী। নারী ভোগ, সম্ভোগ ও উপভোগের বস্তু নয়; নারী হলো প্রশান্তি, স্থিরতা ও ভালোবাসার ঠিকানা।

নারীকে ইসলাম কীভাবে সম্মান করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ :

- ইসলাম নারীকে জীবনসঙ্গী পছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছে। সন্তানদের প্রতিপালনের বড় একটা অংশের দায়িত্ব তার হাতে সমর্পণ করেছে। নবীজী (সা.) বলেন, 'নারী তার স্বামী গৃহের দায়িত্বশীলা। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারী : ৮৫৩)
- ইসলাম নারীর নাম ও বংশ পরিচয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। সুতরাং বিয়ের পরে নারীর পরিচয় পরিবর্তন হবে না; বরং সে সবসময়ই নিজের পিতা ও বংশ পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে।

> আজকের পৃথিবীর কিছু কলম-ব্যবসায়ী মিডিয়া ইসলামকে নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত করে। তাদের অভিযোগ, ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করেছে। আধুনিক যুগ ও সভ্যতার সঙ্গে এমন ধর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়! অথচ বাস্তব ময়দানে আমরা দেখতে পাই একচোখা মিডিয়ার এমন দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। আজকের পৃথিবীতে বৃটেনের মতো উন্নত দেশগুলোতে নওমুসলিমদের মধ্যে পঁচাত্তর ভাগ হচ্ছেন নারী। পরিবার ও সমাজে নারীর ব্যাপারে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো অধ্যয়নের পরেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন! (দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্ট : ৬/১১/২০১১ ইং)

- জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমান অংশীদার ঘোষণা করেছে। উদাহরণ হিসেবে ব্যবসায়িক লেনদেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নবীজী (সা.) বলেছেন, 'নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।' (আবু দাউদ : ২৩৬)

- কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীত ইসলাম পুরুষের ওপর পরিবারভুক্ত নারীর দেখভাল ও তত্ত্বাবধান আবশ্যক করেছে। উদাহরণত স্ত্রী, মাতা, মেয়ে- এদের পেছনে ব্যয় করা ও এদের তত্ত্বাবধান করা পুরুষের জন্য অপরিহার্য।

- মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমানভাগ দিয়েছে। তবে কোথাও পুরুষের চেয়ে নারীকে কম দিয়েছে; কোথাও বা বেশি দিয়েছে। বণ্টনের ক্ষেত্রে এই যে বৈচিত্র্য, সেটা মূলত মৃতব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে কিছু মাথামোটা ও দিনকানা লোক যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে কম দিয়েছে সেগুলোকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানায়। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরার মিশন বাস্তবায়নে নেমে পড়ে। অথচ এর বিপরীতে সেসব ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর ইসলাম যেসব অর্থনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছে সেগুলোর দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। এখানে জীবনের সকল দিকে তাকিয়ে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। একদিক ধরতে গিয়ে আরেকদিক ছেড়ে দেয়া হয়নি।

- আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও ইসলাম সহায়-সম্পদহীন অসহায় নারীর দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধায়নের ব্যাপারে জোর দিয়েছে। এমন নারীর সেবার প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং সেটাকে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। নবীজী (সা.) বলেন, 'বিধবা ও মিসকীনের স্বার্থে যিনি কাজ করেন, তিনি আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ক্লান্তিহীন নামাজী ও বিরতিহীন রোজাদার (সমতুল্য)। (বুখারী : ৫৬৬১)

> মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমানভাগ দিয়েছে। তবে কোথাও পুরুষের চেয়ে নারীকে কম দিয়েছে; কোথাও বা বেশি দিয়েছে।

ইসলাম যেসব নারীর দেখাশোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে :

মাতা : এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সা.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীর আমার সদাচরণের সবচেয়ে উপুযুক্ত কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা'। লোকটি বললো, এরপর? নবীজী (সা.) বললেন, 'অতঃপর তোমার মাতা'। সে বললো, এরপর? তিনি বললেন, 'এরপর তোমার মাতা'। লোকটি বললো, এরপর? তিনি বললেন, 'এরপর তোমার পিতা'। (বুখারী : ৫৬২৬)

মেয়ে : নবীজী (সা.) বলেছেন, 'যার তিনটি মেয়ে থাকবে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরবে, তাদের খাবার, পানীয় ও পোশাক দিবে। কিয়ামতের দিন সেসব মেয়ে তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে।' (ইবনে মাজাহ : ৩৬৬৯)

স্ত্রী : নবীজী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।' (তিরমিযী : ৩৮৯৫)

> নারী ও পুরুষের সম্পর্ক সম্পূরণের; সংঘাতের নয়। একে অন্যের পাশে থেকে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করবে।

ইসলামে নারী-পুরষে কোনো সংঘাত নেই

ইসলামে পুরুষ ও নারীর মাঝে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের জায়গা নেই। সংঘাত নেই। পার্থিব সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতার অর্থ নেই। নারীর ওপর কিংবা পুরুষের আক্রমণ, মর্যাদাহানির অপচেষ্টা কিংবা ছিদ্রান্বেষণের অনুমতি নেই।

নিজের অর্ধাঙ্গের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করে কীভাবে? ভাই ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে? রাসূল (সা.) নারীকে পুরুষের অর্ধাংশ এবং সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। সে কারণে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক পরিপূরকের; সংঘাতের নয়। একে অন্যের পাশে থেকে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করবে।

কুরআন নারী-পুরুষের এই সম্পূরণের জায়গাটা বিস্ময়করভাবে তুলে ধরেছে এভাবে: তারা (নারী) তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ। (বাক্বারা : ১৮৭)

সুতরাং পুরুষ প্রথম দৃষ্টিতে নারীকে যে অবলা-অক্ষমা-দুর্বলা ভাবে সেটা ভুল। তার মাঝে এমন শক্তি রয়েছে যেটা পুরুষের মাঝে নেই। অথচ একটি পরিবার গঠনে সে শক্তির বিকল্প নেই। একইভাবে নারী পুরুষের মাঝে যে দুর্বলতা দেখে সেটাও তার উপলব্ধির বাইরে। পুরুষের ভেতরে এমন শক্তি রয়েছে যেটা তার মাঝে নেই। অথচ জীবন ও সংসার সে শক্তি ব্যতীত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আল্লাহ সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতেই নারী ও পুরুষের মাঝে এমন বৈচিত্র্য ঢেলে দিয়েছেন। যদি নারী পুরুষের মাঝে এই বৈচিত্র্য না থাকতো, সবদিক থেকে উভয়ে সমান হতো- তবে আলাদাভাবে আলাদা অবয়বে তাদের সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল?

নবীজীর জীবদ্দশায় কিছু পুরুষ মহিলাদের যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে সেটা পাওয়ার আশা প্রকাশ করেছিল। কিছু নারীও পুরুষের সুবিধা পাওয়ার আশা করেছিল। তখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : 'আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা সেগুলোর প্রত্যাশা রেখো না। পুরুষ যা করবে সেটার ফল পাবে। নারীও যা করবে সেটার ফল পাবে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।' (নিসা : ৩২) সুতরাং নারী পুরুষ প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও সম্মান। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজস্ব ভূমিকা পালন করে যাবে। নারী কিংবা পুরুষ কারও স্বার্থে শরীয়ত আসেনি। শরীয়ত এসেছে মানুষের স্বার্থে। পরিবার ও সমাজের স্বার্থে।

কিন্তু এসব থেকে আমাদের জন্য যেটা শিক্ষণীয় তা হলো, সকল সম্প্রদায় মনে করতো, নারী পুরুষের মাঝে সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ প্রয়োজন। যাতে করে মানব জীবন যেন জঙ্গল কিংবা খোয়াড়ে পরিণত না হয়। মানুষ ও পশুর মাঝের পার্থক্যটা যেন মুছে না যায়।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক

ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে মানব সভ্যতা নারী ও পুরুষের মাঝের সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য অসংখ্য চেষ্টা-তদবীর করে আসছে। এই সম্পর্ক সুশৃঙ্খল ও নিরোপদ্রুব করার লক্ষ্যে অসংখ্য সীমারেখা বেঁধে দিয়েছে, আইন-কানুন নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আদৌ কি সেটা সুবিন্যস্ত ও সুন্দর হয়েছে? ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো সাক্ষী, পৃথিবীতে অসংখ্য সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতো। নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্ক ছিল চরম এলোমেলো বিশৃঙ্খল ও জবুথবু। নির্বিচার যৌনতার মাঝে ডুবে ছিল এসব সম্প্রদায়। অনেক সম্প্রদায় নারীকে অশনী বস্তু ঠাওর করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতো। কেনো কোনো সম্প্রদায় নারীর পরিবর্তে পুরুষকে পর্দা করাতো। কোথাও আবার শরীরের কোনো অংশ ঢেকে বাকি অংশ খোলা রাখতো। এভাবেই চলছিল বিশৃঙ্খলার জয়গান।

কিন্তু এসব থেকে আমাদের জন্য যেটা শিক্ষণীয় তা হলো, সকল সম্প্রদায় মনে করতো, নারী পুরুষের মাঝে সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ প্রয়োজন। যাতে করে মানব জীবন যেন জঙ্গল কিংবা খোয়াড়ে পরিণত না হয়। মানুষ ও পশুর মাঝের পার্থক্যটা যেন মুছে না যায়।

ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি

ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিছক ইতিহাস ও ভৌগোলিক উপাদানে ভর করে গড়ে ওঠা সীমাবদ্ধ মানব-বুদ্ধির আবিষ্কার নয়; বরং এটা সার্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। নবীজী (সা.) এটা মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।

সে কারণে ইসলামের নারী-পুরুষের সম্পর্ক সব সময় এক ধরনের নয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই এটা প্রণীত। নিচে আমরা সংক্ষেপে এব্যাপারে আলোকপাত করবো।

নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে পুরুষকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় :

১. পুরুষ যখন নারীর স্বামী :

নারী ও পুরুষের মাঝে যখন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন গড়ে ওঠে, তখন সেই সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি কেমন হবে সে ব্যাপারে কুরআনের চেয়ে সুন্দর ও সূক্ষ্ম আর কোনো বর্ণনা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা স্বামীকে স্ত্রীর জন্য পোশাক আখ্যায়িত করেছেন। একইভাবে স্ত্রীকে স্বামীর পোশাক আখ্যা দিয়েছেন। এটা এমন এক সম্পর্ক- যেখানে মন ও মানস, অনুভব ও অনুভূতি, দেহ ও কায়া- সবকিছু একাত্মায় লীন হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'তারা (নারী) তোমাদের (পুরুষের) জন্য পোশাক। আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক।' (বাক্বারা : ১৮৭)

২. পুরুষ যখন নারীর মাহরাম (নিকটাত্মীয়) :

ইসলামে 'মাহরাম' বলা হয় এমন পুরুষকে, নারীর খুব কাছের আত্মীয় হওয়ার কারণে যাদের মাঝে বিবাহ বন্ধন চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয়। নারীর জন্য ১৩ জন নিকটাত্মীয় পুরুষ মাহরাম হয়ে থাকে: পিতা, দাদা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা, ভাতিজা বা ভাগিনা, পৌত্র বা দৌহিত্র প্রমুখ। নারী স্বাভাবিকভাবে শরীর ঢেকে পর্দা ছাড়াই এসব পুরুষের সামনে আসতে পারবে।

৩. পুরুষ যখন নারীর 'অপরিচিত' :

'অপরিচিত' (বা পরপুরুষ) বলতে সেসব পুরুষকে বোঝানো হয়, যারা নারীর 'মাহরাম' নন। এ কারণে দেখা যায় অনেক আত্মীয়ও এই ক্যাটাগরিতে পড়েন।

মূলত নারীর সম্মান, মর্যাদা, সতীত্ব ও চরিত্রের সুরক্ষার নিমিত্তেই ইসলাম এ ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসংখ্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই কোন্ ধরনের বিধি-বিধান ও কোন্ ধরনের সম্পর্ক তাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকর সেটা তাঁর চেয়ে কে আর ভালো বুঝবে? কুরআনে এসেছে, 'মনে রেখো! সৃষ্টিকে তিনি ভালো করেই জানেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও পূর্ণ অবগত।' (মুলক : ১৪)

পরপুরুষের সামনে নারীর পর্দা আবশ্যক হওয়ার তাৎপর্য :

- যাতে করে নারী নিজের সম্মান ও সম্ভ্রম সুরক্ষিত রেখে জীবন ও জগতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কর্মের ময়দানে সর্বোচ্চ স্বাক্ষরতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারে।
- এতে করে সমাজে ফিতনা ও অশ্লীলতার পরিধি সংকুচিত হবে। সমাজে পবিত্রতার আলো ছড়াবে। নারীর সম্ভ্রম সুরক্ষিত থাকবে।
- এটা পুরুষের চরিত্র ও নৈতিকতা ধরে রাখতেও সাহায্য করবে। তখন পুরুষরা তার সঙ্গে একজন মানুষ হিসেবে আচরণ করবে। যার তাদের মতোই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। সে নিছক লালসার বস্তু কিংবা ভোগ্যপণ্য নয়।

অপরিচিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের নীতিমালা

১. দৃষ্টি অবনত রাখা :

আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ উভয়কেই অপরিচিত কারও থেকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে করে তাদের উভয়ের চরিত্র ও সতীত্ব সংরক্ষিত থাকবে। বস্তুত উত্তেজনাকর কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সংকট তৈরির প্রথম ধাপ। তাছাড়া নির্বিচারে চক্ষু চালানো পাপ, অশ্লীলতা, নোংরামি ও কলুষতার পথ। কুরআন বলেছে, 'আপনি মুমিন পুরুষদের বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে। এটাই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তারা যা করেন সেসম্পর্কে পূর্ণ অবহিত- আর আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের সতীত্বের সংরক্ষণ করে।' (আন নূর : ৩০-৩১)

২. আদব ও উত্তম চরিত্রের সঙ্গে আচরণ করা :

শিক্ষা-দীক্ষা, কাজ-কর্মসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিচিত নারী-পুরুষকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধাবোধ ও উত্তম চরিত্রের সঙ্গে আচরণ করবে। তবে এ সম্পর্ক কেনোভাবেই যেন ভিন্নদিকে না গড়ায় এব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

৩. পর্দা :

আল্লাহ তাআলাকে নারী জাতিকে রূপবতী, কমণীয় ও লাবণ্যময়ী সৃষ্টি করেছেন। ফলে পুরুষের তুলনায় নারীরা অধিক ফিতনার সম্মুখীন হয়। আর এ কারণে আল্লাহ তাদের ওপর পর্দা ফরজ করেছেন। কিন্তু পুরুষদের ওপর ফরজ করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, সভ্যতার প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুগে নারীরাই যৌন নিপীড়ন, পুরুষের কাম-বাসনার ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে। বিপরীতটা কিন্তু হয়নি। বরং আজকের পৃথিবীতেও বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা দেখি নারীদের কীভাবে পুরুষের হাতের যৌন-পুতুলে পরিণত করা হয়েছে।

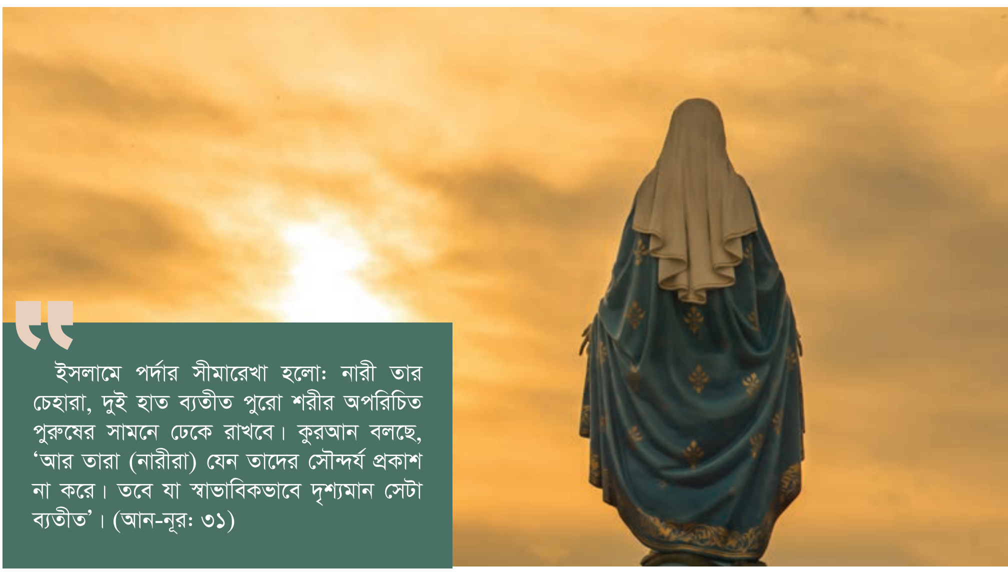

"ইসলামে পর্দার সীমারেখা হলো: নারী তার চেহারা, দুই হাত ব্যতীত পুরো শরীর অপরিচিত পুরুষের সামনে ঢেকে রাখবে। কুরআন বলছে, 'আর তারা (নারীরা) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যা স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান সেটা ব্যতীত'। (আন-নূর: ৩১)

ইসলামে পানাহারের বিধান

ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ প্রথমেই সাধারণত যেসব প্রশ্ন করে থাকেন তন্মধ্যে একটি হলো : ইসলাম কেন অ্যালকোহল এবং শূকরকে হারাম করেছে?

ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ প্রথেমই সাধারণত যেসব প্রশ্ন করে থাকেন তন্মধ্যে একটি হলো : ইসলাম কেন অ্যালকোহল এবং শূকরকে হারাম করেছে?

প্রশ্নটির জবাব দেয়ার আগে ভূমিকাস্বরূপ দু'টি কথা বলা জরুরি :

কুরআন মুসলমানদেরকে ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান সবকিছু থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আমাদের উপকারের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। (বাক্বারা : ২৯)

সুতরাং সকল খাদ্য ও পানীয় এই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কিছু বস্তু কদর্য, অপবিত্র ও মানুষের স্বাস্থ্য ও মস্তিস্কের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় আল্লাহ সেগুলো হারাম করে দিয়েছেন। চলুন এবার শূকর ও অ্যালকোহল হারাম হওয়া নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শূকর :

পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় শূকর ভক্ষণকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ তৎকালীন সময়ে আরবদের নিকট শূকরের পরিচিতি ছিল না। তাহলে এতটা জোর দিয়ে এটাকে হারাম করার তাৎপর্য কী? বাস্তবতা হলো কুরআনেই সর্বপ্রথম শূকর হারাম করা হয়নি। কুরআনের আগে ইহুদি ধর্মেও এটাকে হারাম করা হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এটা সুস্পষ্ট। বরং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অনেক গবেষক ও ধর্মতাত্ত্বিকের বক্তব্য মতে খ্রিস্টধর্মেও শূকর হারাম ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মের অনেক বক্তব্যে এটা সুস্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা এসব বক্তব্য বিকৃত করে ফেলে। (দেখুন : মার্কস: ৫/১১-১৩, মথি: ৬৭; পিটারের দ্বিতীয় পত্র: ২/২২; লূক: ১৫/১১)

গোটা ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ভক্ষণ হালাল করে দিয়ে যদি দুয়েকটি খাদ্য হারাম করেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা স্বরূপ এমন নির্দেশ নিতান্তই স্বাভাবিক। আদম (আ.) কে তো এভাবেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। জান্নাতের সকল পবিত্র বস্তু তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছিল। কেবল একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গোটা ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ভক্ষণ হালাল করে দিয়ে যদি দুয়েকটি খাদ্য হারাম করেন এতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা স্বরূপ এমন নির্দেশ নিতান্তই স্বাভাবিক। আদম আ. কে তো এভাবেই পরীক্ষা করা হয়েছিল। জান্নাতের সকল পবিত্র বস্তু তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছিল। কেবল একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

মাদক ও অ্যালকোহল :

মহামারী ও মানব জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ দুরারোগ্য রোগব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক দেশ ও সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার সামান্য অবহেলা করলে সেটার ফলাফল হয় চরম মারাত্মক ও ভয়ংকর।

চরম অবিশ্বাস্য হলেও রূঢ় বাস্তবতা হলো প্রতিবছর পৃথিবীতে এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা- একত্রে এই তিনটি রোগে যতজন মানুষ মারা যায় মদ্যপান করে মারা যায় এর চেয়ে বেশি মানুষ! বরং প্রতি বছর সকল যুদ্ধ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যত মানুষ মারা যায়, মদ খেয়ে মারা যায় তার চেয়ে তিন গুণ বেশি মানুষ! বিশ্বের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সংস্থার গবেষণায় এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এর মাঝে সর্বাগ্রে রয়েছে বিখ্যাত ন্যাচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত (১৫ মার্চ, ২০১২) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট (১১/২/২০১১)। এবার চলুন সবিস্তারে কিছু রিপোর্ট দেখে নেয়া যাক :

অ্যালকোহল ও নেশার কারণে প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় আড়াই মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তাদের মাঝে তিন লক্ষ বিশ হাজার জনের বয়স ১৫-২৯ এর মাঝামাঝি! যারা অ্যালকোহলজনিত কারণে মারা যাচ্ছে! এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রতিবছর অ্যালকোহলে মৃত্যুবরণকারীদের প্রায় নয় শতাংশ যৌবনেই এ অভিশাপ পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে!!

একটি মার্কিন গবেষণা সূত্রে দেখা গেছে প্রতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত লক্ষ শিক্ষার্থী সেখানের নেশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

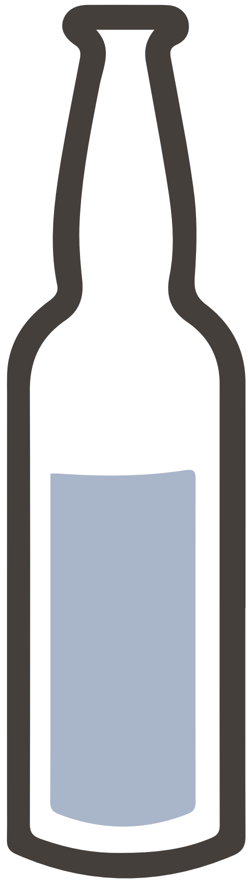

২০০১ সালের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, এস্তোনিয়াতে যুবকদের পক্ষ থেকে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতার প্রায় আশি ভাগ কোনো না কোনোভাবেই অ্যালকোহল গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

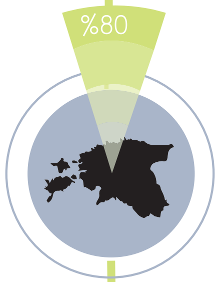

গোটা বিশ্বে সংঘটিত হত্যা ও খুনের ঘটনার প্রায় এক চতুর্থাংশ অ্যালকোহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

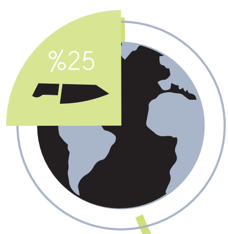

আর এ কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল রিপোর্ট ও গবেষণায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অ্যালকোহল জনিত এসব ট্রাজেডি বন্ধ কিংবা নিদেনপক্ষে কমানোর জন্য কঠিন পদক্ষেপ ও কঠোর আইন প্রণয়নের জন আহ্বান করে।

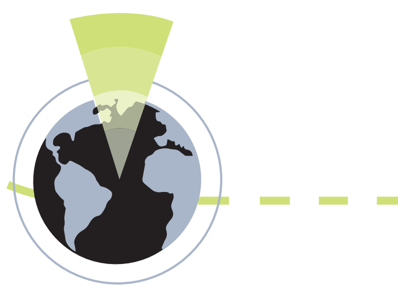

কেবল বৃটেনেই মাত্র এক বছরে :

- অ্যালকোহলের সঙ্গে জড়িত প্রায় দশ লক্ষ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বিবেচনায় এনে হিসাব করলে দেখা যায় পুরো বৃটেনে সারা বছর সংঘটিত সকল সহিংসতার ঘটনার প্রায় অর্ধেক অ্যালকোহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
- বৃটেনের হাসপাতালগুলোর সড়ক দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগে প্রতি বছর প্রায় সাত মিলিয়ন মানুষ ভর্তি হয় অ্যালকোহলের সঙ্গে জড়িত হয়ে। এতে সরকারের প্রতি ট্যাক্স আদায়কারী জনগণের ঘাড়ে চাপানো খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ছয়শত পঞ্চাশ মিলিয়ন বৃটিশ পাউন্ড!
- সংক্ষেপে বলা যায়– প্রতি বছর ট্যাক্স প্রদানকারী জনগণের ঘাড়ে চাপানো অ্যালকোহল জনিত বিভিন্ন অপরাধ ও সহিংসতার ঘটনার সামগ্রিক ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৮ থেকে ১৩ বিলিয়ন বৃটিশ পাউন্ড!

মদ ও অ্যালকোহলের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি :

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অ্যালকোহলের যে ভীষণ নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে সেটা আবিস্কারের জন্য ইসলাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যার রিপোর্ট ও বিবৃতির অপেক্ষায় বসে থাকেনি। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের জীবন ও মানব সমাজের জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা ক্ষতিকর সেটা তিনিই ভালো জানেন।

ইসলাম এমন একটি সময়ে আরবে এসেছিল যখন আরব সমাজ মদ ও শরাব-আসবে নিমজ্জিত ছিল। বিচিত্র ধরনের সুরা-আরক আর মদিরা ছিল তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ভোগের উপাদান। একদিকে এসব নেশায় চুর হয়ে থাকতো। অপরদিকে এগুলো নিয়ে দম্ভ করতো। জীবনের সব অর্জন উড়িয়ে দিতো নেশার পেছনে।

এ কারণে কুরআন মদ ও আরবদের মাঝের সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করেই অত্যন্ত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত পন্থায় বিষয়টি সমাধান করেছে। প্রথমেই কুরআন মদকে একবাক্যে নিষিদ্ধ করেনি; বরং বলেছে মদে কিছুটা উপকারিতা রয়েছে। এটা মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ। একবার আসক্ত হয়ে পড়লে এটা ছেড়ে অসম্ভবপ্রায়। তখন এর প্রতিকার করা কিংবা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরীক ভয়ংকর পরিণতি ও কুপ্রভাব ঠেকানো দুরূহ। কুরআন বলেছে, ‘তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন- তাতে রয়েছে বিশাল পাপ (ক্ষতি) আর মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা। কিন্তু এগুলোর উপকারিতার চেয়ে ক্ষতি ঢের বেশি। (বাক্বারা : ২১৯)

এরপর এক পর্যায়ে এসে মদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মদ্যপানকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়। বলা হয়, এটা মানুষের মাঝে বিগ্রহ-বিসংবাদের আগুন জ্বালায়। গুরুত্বপূর্ণ ও ভালো কাজের প্রতিবন্ধক হয়। এরপর কুরআন মানুষকে সরাসরি প্রশ্ন করে, ‘সুতরাং তোমরা কি ওটা ছাড়বে না?’ তখন মুসলমানগণ জবাব দিলেন, আমরা ছেড়ে দিলাম। আমরা পরিত্যাগ করলাম। আল্লাহর নির্দেশে সবাই মদ ছেড়ে দিলেন। গোটা মদীনার রাস্তা-ঘাট আর অলিগলিতে মদের জোয়ার বয়ে চললো।

গোনাহ ও তওবা

কুরআন

ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের দর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসে যুগে যুগে চিন্তাগত এক জটিল গোলকধাঁধায় আবর্তিত হয়ে আসছে। আর সে কারণেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে- এটা নিয়েও বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন সমাধান পেশ করেছে।

কিন্তু ইসলাম সর্বাগ্রে মানুষের অভ্যন্তরে নিহিত প্রকৃতির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করেছে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টিগতভাবেই তার ভেতরে ভালো ও মন্দ দু'টোর দিকেই একটা আকর্ষণবোধ তৈরি করেছেন। ফলে ইসলাম মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে নিষ্পাপ ফিরিশতা মনে করে না। ইসলাম বলে, প্রত্যেক আদম সন্তান দ্বারাই ভুলচুক হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আর এভাবেই গড়ে উঠেছে ইসলামে পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দর্শন। সংক্ষেপে আমরা নিচে বিষয়টি তুলে ধরছি :

- সর্বপ্রথম কুরআনের যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে সেটা হলো, পাপ ও অপরাধ একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। যার ফলে পাপের প্রায়শ্চিত্তও ব্যক্তিগত পর্যায়েই হবে। কুরআনে এ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ ও পরিস্কার। ইসলাম মানুষের জন্মের আগেই তার ওপর পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয় না। প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, অমলিন ও কলুষমুক্ত অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম নেয়। যে কারণে (খ্রিস্টান ধর্মের মতো) কারও এসে নিজের জীবনের বিনিময়ে গোটা মানবতার পাপমুক্তির দরকার হয় না। পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আ.) এর ভ্রান্তি ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত। তাছাড়া তিনি অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সেটার দায়ভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছেন। তাই আজকে যদি কোনো মানুষ ভুল ও অন্যায় করে সেটাও তার ব্যক্তিগত। প্রায়শ্চিত্তের দরজাও সতত উন্মুক্ত। প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব বোঝা বহন করবে। একজনের ভুলে অন্য কেউ দায়ী নয়। এটাই যুগে যুগে আল্লাহর নবীগণ তাদের উম্মতকে জানিয়েছেন। কুরআনে এসেছে : 'মূসার কিতাবগুলোতে যা ছিল সেটা কি বলা হয়নি? আর যা ছিল ইবরাহীমের কিতাবে, যিনি পূর্ণ করেছেন। তাতে ছিল– একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। আর মানুষের জন্য শুধু তা-ই রয়েছে যা সে চেষ্টা করে। মানুষ তার চেষ্টার ফল পাবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।' (নাজম : ৩৬-৪১)
- 'তওবা' (প্রায়শ্চিত্ত) ইসলামের একটি বড় ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের বিশাল মাধ্যম। তওবার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত। এটার জন্য বিশেষ কোনো সময় বা স্থানের প্রয়োজন নেই। কোনো মানুষের সামনে হওয়ার কিংবা কারও অনুমতি থাকার দরকার নেই। কারণ এটা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝের একান্ত ব্যাপার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর যেসকল নাম ও গুণের কথা এসেছে তন্মধ্যে কিছু এমন : 'তওবা কবুলকারী', 'পরম দয়ালু', 'পাপ ক্ষমাকারী'। কুরআনে কারীম যখন আমাদের কাছে জান্নাতীদের বর্ণনা দেয়, তখন মুত্তাকীদের কথা উল্লেখ করে। এরা হলো সেসব লোক যারা কখনও কখনও কিছু অপরাধ করে ফেলে। কিন্তু হুঁশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত আল্লাহর দিকে ফিরে

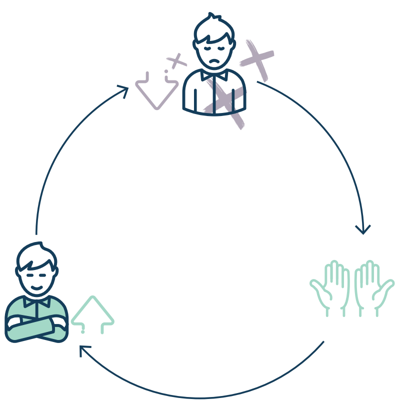

> ইসলামে তওবার মর্ম কথা হলো, কোনো অপরাধ করে ফেলার পরে সেটা থেকে বিরত হওয়া, কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর সেটা না করার অঙ্গীকার করা। তবে অপরাধটি যদি কেনো মানুষের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাতে কারও অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে, তবে সেই অধিকারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

যায়, অনুশোচিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আর তারা যখন কোনো অপরাধ করে ফেলে কিংবা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করে ফেলে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে অপরাধ ক্ষমা করার? আর তারা জেনেশুনে আবারও সেই অপরাধে লিপ্ত হয় না। (আলে ইমরান : ১৩৫)

ইসলামে তওবার মর্ম কথা হলো, কোনো অপরাধ করে ফেলার পরে সেটা থেকে বিরত হওয়া, কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর সেটা না করার অঙ্গীকার করা। তবে অপরাধটি যদি কেনো মানুষের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাতে কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, তবে সেই অধিকারও ফিরিয়ে দিতে হবে। এসবকিছু করার পরেও যদি কেউ আবার কখনও আগের অপরাধে পুনরায় লিপ্ত হয়, তথাপি তার পূর্বের তওবা বাতিল হবে না। সেই অপরাধের গোনাহ ফিরে আসবে না। বরং সে নতুন একটি অপরাধ করলো। এর জন্য তাকে আবার তওবা করতে হবে।

এভাবেই ইসলামের ছায়ায় একজন মানুষ একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। আত্মিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি, অন্যায়-অপরাধ থেকে দূরাবস্থানের পূর্ণ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা থাকে। মানবীয় প্রকৃতি যে কোনো সময় হেদায়াতের রাজপথ থেকে ছিটকে পড়তে পারে। এ কারণে একজন মুসলিমের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো জীবনের যে কোনো অবস্থাতেই যেন নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। যাতে করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে পারে। তওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারে।

কুরআনের বক্তব্য মতে, এটাই হলো সৎকর্মশীল আর অন্যদের মাঝে পার্থক্য। কারণ মুত্তাকী তথা সৎকর্মশীলদের দ্বারা যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তারা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু অন্যরা বেপরোয়াভাবে একই অপরাধ বারবার করতে থাকে।

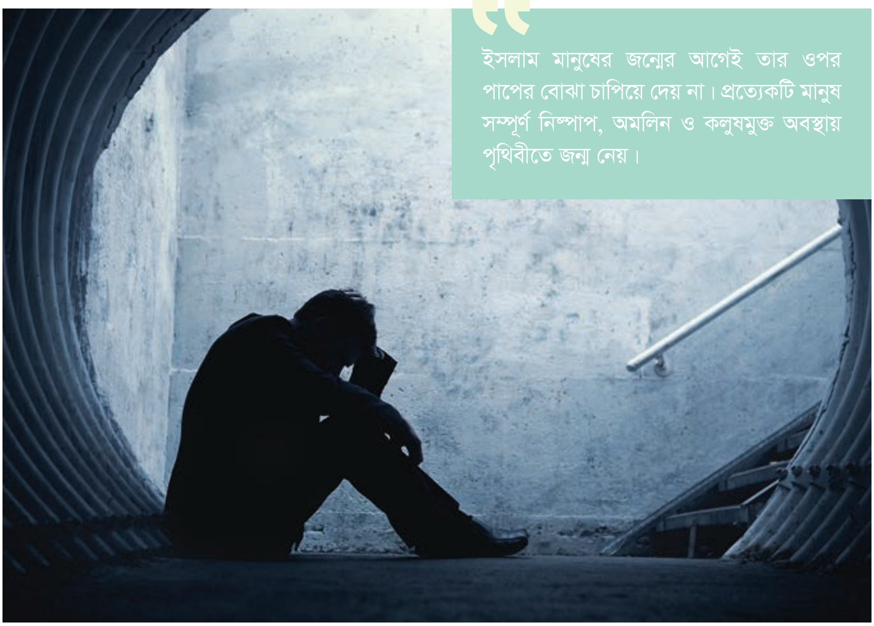

> ইসলাম মানুষের জন্মের আগেই তার ওপর পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয় না। প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, অমলিন ও কলুষমুক্ত অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম নেয়।

ধর্ম ও যুক্তির সংঘাত

অনেকের ধারণা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক। কারণ একদিকে ধর্মের উৎস হলো যুক্তিহীন ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার। অপরদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন হলো সুশৃঙ্খল ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানের রাজপথ। কিন্তু এমন ধারণা কতটুকু সঠিক? চিন্তা করলে একমুখী উত্তর দেয়া অসম্ভব। এমন ধারণা ভুল-শুদ্ধের মিশেলে গড়ে ওঠা দ্রবণ।

অনেকের ধারণা, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক। কারণ একদিকে ধর্মের উৎস হলো যুক্তিহীন ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার। অপরদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন হলো সুশৃঙ্খল ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানের রাজপথ। কিন্তু এমন ধারণা কতটুকু সঠিক? চিন্তা করলে একমুখী উত্তর দেয়া অসম্ভব। এমন ধারণা ভুল-শুদ্ধের মিশেলে গড়ে ওঠা দ্রবণ।

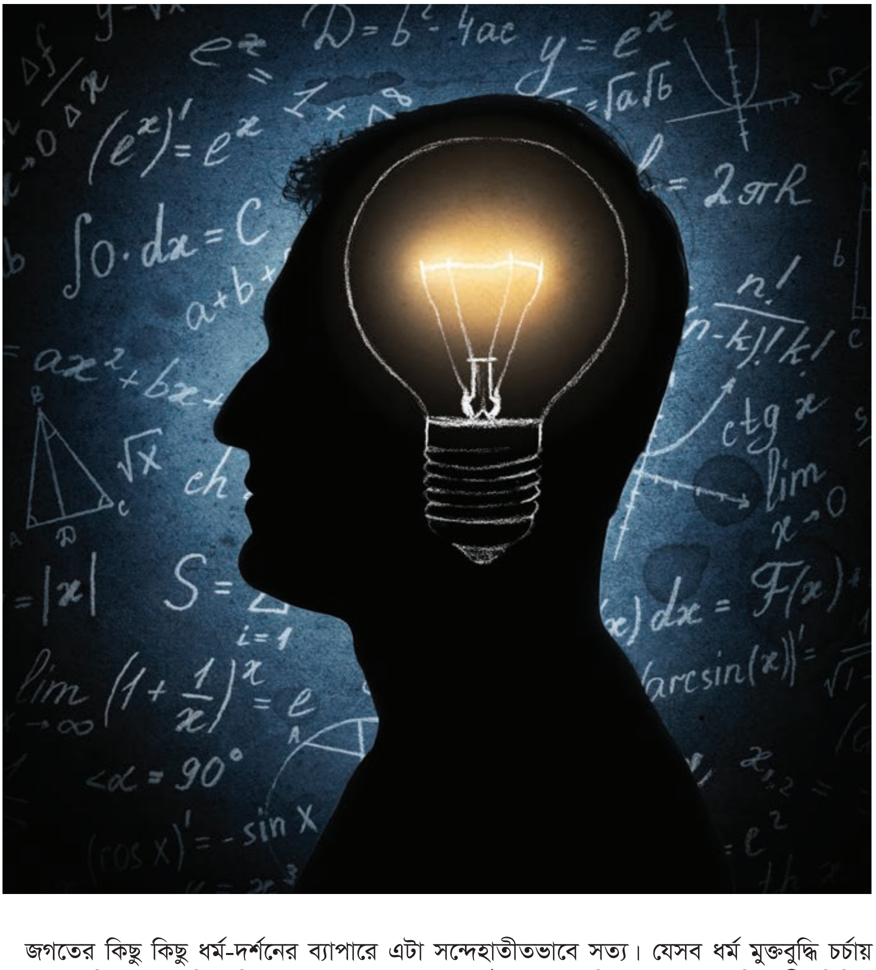

জগতের কিছু কিছু ধর্ম-দর্শনের ব্যাপারে এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যেসব ধর্ম মুক্তবুদ্ধি চর্চায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। যুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এসব ধর্মের গ্রন্থসমূহ বিজ্ঞান ও বাস্ততাবিরোধী বিভিন্ন উদ্ভট কুসংস্কার, বানোয়াট লোকগাথা ও পৌরাণিক কল্প-কাহিনীতে টইটম্বুর।

কিন্তু নির্বিচারে সকল ধর্মের ব্যাপারে যদি এমন কথা বলা হয় তবে সেটা ভুল হবে। কারণ ধর্মগ্রন্থের উৎস, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি ও দলীল-প্রমাণাদির বিচারে এগুলোর মাঝে রয়েছে ঢের পার্থক্য।

ইসলাম যুক্তি ও বিবেকের প্রতি যতটা সম্মান প্রদর্শন করেছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম-বিশ্বাস তার ধারেকাছেও নেই। ইসলামের প্রধান উৎস পবিত্র কুরআনের দিকে যে কেউ সামান্য দৃষ্টি দিলেই এটা তার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কুরআন এতটাই খোলামেলা ও স্পষ্ট ভাষায় যুক্তির প্রতি উৎসাহিত করেছে, চিন্তা-ভাবনার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যে, সেটা বোঝার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার দরকার নেই। ফলে আমরা দেখতে পাই, কেবল 'তোমরা কি চিন্তা করো না'? বাক্যটিই কুরআনে তেরো বারেরও বেশি পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

"কুরআন এতটাই খোলামেলা ও স্পষ্ট ভাষায় যুক্তির প্রতি উৎসাহিত করেছে, চিন্তা-ভাবনার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যে, সেটা বোঝার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার দরকার নেই।

যুক্তিচর্চায় কুরআনী নির্দেশনা ফুটে ওঠে বিচিত্র ক্ষেত্রে

১ পবিত্র কুরআন বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত, উদারচিত্ত এবং সবধরনের স্বৈরাচার, দম্ভ, ভীতি ও অজ্ঞানতার অন্ধকার-মুক্ত মানুষকে সম্বোধন করেছে। যার ফলে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্যতা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করেছে। যথা আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কোনো কিছু ছাড়া এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে নাকি তারা সৃষ্টিকর্তা! নাকি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে! বরং তারা বিশ্বাস করে না। (তূর : ৩৫-৩৬)

২ কুরআন বিরুদ্ধবাদীদের কথা কেটেছে। তাদের প্রমাণশূন্য, অমূলক ও শেকড়বিহীন বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘোষণা দিয়েছে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো– তবে প্রমাণ নিয়ে আসো।' (বাকারা : ১১১)

৩ যারা বুদ্ধির চর্চা করে না, বিবেক কাজে লাগায় না, কুরআন তাদের ভর্ৎসনা করেছে। তাদের অনুভূতিশূন্য আখ্যা দিয়েছে। কারণ তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আল্লাহ বলেন, তারা কেন ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না যাতে তাদের হৃদয় প্রস্তুত হয় যদ্বারা তারা বুঝতে পারে। যাতে কর্ণ তৈরি হয় যার দ্বারা তারা শ্রবণ করতে পারে। কেননা চর্মচক্ষু তো অন্ধ হয় না। অন্ধ হয় মানুষের বুকের ভেতরে থাকা অন্তর্চক্ষু। (সূরা হজ্জ : ৪৬)

৪ কুরআন সুস্থ যুক্তিচর্চা-বিরোধী কিছু ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছে। ফলে কুরআন কেবল আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-অনুভূতিগুলোর ব্যবহার এবং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক স্খলনের ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কারণ মানবীয় প্রকৃতি স্বভাবগতভাবেই দুর্বল। ভালো-মন্দের মাঝে দোদুল্যমান। যার ফলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে যে কোনো সময় ভুলের শিকার, সত্যচ্যুত ও বাস্তবতাবিবর্জিত হতে পারে।

> “মুসলিম মাত্রই বিশ্বাস করে, আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ এবং মানুষের জন্য তাঁর দেয়া বিধানের মাঝে কোনোদিনও সংঘাত হতে পারে না। সুতরাং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাতে শংকার কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনের ব্যাখ্যায় সুস্থচিন্তার যত অন্তরায়

- **অন্ধ-অনুসরণ :** বিশ্বাস, আচার-অভ্যাস ও নেতিবাচক চিন্তাগত অভ্যাসের উত্তরাধিকার মানুষের সুস্থ চিন্তাচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব ফেলে। এতে করে মানুষের নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য গ্রহণ এবং মিথ্যা বর্জন করতে কষ্ট হয়; বরং কখনও কখনও স্বাধীন চিন্তার পথ পুরোপুরি রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই বড় হয়েছি, জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি- এমন অসংখ্য কুযুক্তি শুদ্ধ ও সুযুক্তির জায়গাটা দখল করে নেয়। কুরআন আমাদের অনেক সভ্যতা, জাতিগোষ্ঠী ও ব্যক্তির উদাহরণ দেখিয়েছে– অন্ধ অনুসরণ যাদের সত্য অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিল। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তাআলা যে সত্য অবতীর্ণ করেছেন সেটার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের অনুসরণ করবো। এরপর কুরআন নিজেই বিস্ময়ভরা প্রশ্ন তুলেছে, যদি তাদের পূর্বপুরুষের পথ যুক্তিহীন ও জ্ঞানবর্জিত হয়ে থাকে, তবুও কি তাদের অনুসরণ করবে কেবল বাপ-দাদা বলে?! (আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন সেটার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যেটার ওপর পেয়েছি সেটার অনুসরণ করবো। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছু বুঝতো না এবং তারা পথপ্রাপ্তও ছিল না!!) (বাকারা : ১৭০)
- **গোঁড়ামি ও দম্ভ :** অনেক সময় মানুষের বিবেক সত্য চিনতে পারে। তবুও পার্থিব লালসা, পদমর্যাদা, স্বার্থান্বেষা, হিংসা কিংবা অহংকারের কারণে মানুষ সেটা গ্রহণ করে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এক শ্রেণীর মানুষের চরিত্র বর্ণনা করে বলেন : তারা জেনে-শুনে সর্বান্তকরণে নিশ্চিত হওয়ার পরেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর প্রধান কারণ ছিল ছিল অহংকার ও সীমালঙ্ঘন। (তাদের অন্তরগুলো সে ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস করার পরেও তারা সেটা অস্বীকার করেছে। সীমালঙ্ঘনও অহংবোধ হেতু।
- **ভোগ-বিলাসে বুঁদ হয়ে থাকা :** অনেক সময় সত্য চেনা সত্ত্বেও সেটা গ্রহণের মতো কলিজা থাকে না। ফলে জীবনের রসরঙ্গ ও লীলাকেলির ওপরে সত্যকে প্রাধান্য দিতে ব্যর্থ হয়। কুরআন আমাদের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছে, যাকে আল্লাহ জ্ঞানের আলো ও দীক্ষা দান করেছিলেন। তার উচিত ছিল জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা এবং জীবনে দীক্ষাগুলো বাস্তবায়িত করা। কিন্তু সে তার জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের পেছনে ছুটে চলে। কারণ সে জীবনের ভোগ-সম্ভোগে এতটাই বুঁদ ছিল, পার্থিব নেশায় এতটাই চুর ছিল যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। (আল-আরাফ : ১৭৫-১৭৬)

কুরআন সর্বদা সব ক্ষেত্রে মানুষকে যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা করতে বলে। প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, চিন্তা-ভাবনা, সর্বোপরি নিজের প্রতি, চারপাশের পৃথিবী ও সৃষ্টির প্রতি নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান করে।

প্রশ্ন ও বুদ্ধিচর্চাকে সে ব্যক্তি ভয় পায় যে নিজের মাঝে এগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু ধারণ ও লালন করে। কিন্তু সত্য ধর্ম আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ এবং মানুষের জন্য তাঁর দেয়া বিধানের মাঝে কোনোদিনও সংঘাত হতে পারে না। সুতরাং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাতে শংকার কোনো অবকাশ নেই। (সাবধান সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই। মহাপবিত্র আল্লাহ তাআলা। গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (আল-আরাফ : ৫৪)

ইসলাম শান্তির ধর্ম

একদিকে

একদিকে গণমাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই রোষানল ও বিষবাষ্প ছড়ানো হয়, এরপর যখন কেউ ইসলামের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন, জানতে পারেন ইসলামে শান্তির কতখানি গুরুত্ব রয়েছে, তখন তিনি থমকে না দাঁড়িয়ে পারেন না। একজন মুসলিম প্রত্যেক দিন একাধিকবার 'সালাম' (শান্তি) শব্দটি মুখে উচ্চারণ করেন এবং হৃদয় দিয়ে এর মর্ম অনুভব করেন।

আল্লাহর একটি নাম হলো 'সালাম' (শান্তিদাতা)। পরকালে জান্নাতের নাম হলো 'দারুস সালাম' (শান্তি নিকেতন)। ইসলামের অভিবাদন-বাক্যের প্রথম শব্দটিও সালাম (শান্তি)। মুসলমানদের প্রত্যেক নামাজও শেষ করতে হয় দু'বার 'সালাম' এর মাধ্যমে। সর্বোপরি 'ইসলাম' ধর্মের নামটির মাঝেও 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা'র অর্থ নিহিত রয়েছে।

ইসলাম সতত শান্তির পথে আহ্বান করে। জগতের দুর্বলতম প্রাণীটিরও অধিকার সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। রাসূল (সা.) আমাদের জানিয়েছেন, 'এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। কারণ সে বিড়ালটিকে বেঁধে রাখতো। খাদ্য-পানি কিছুই দিতো না। বেঁধে রাখার কারণে বিড়ালটি নিজেও কিছু খেতে পারতো না। ফলে এক সময় সেটা মারা গেলো' (মুসলিম : ২২৪২)। অপরদিকে এক ব্যাভিচারী নারী একটি কুকুরকে পানি পান করানোর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে ইসলাম জগতের সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে অসংখ্য বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। আশ্চর্য বিধানাবলি প্রণয়ন করেছে। এমনকি নবী মুহাম্মাদ (সা.) হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমকে জুলুম করবে বা কষ্ট দেবে, কিংবা তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেবে, শেষ দিবসের বিচারের দিন স্বয়ং নবীজী (সা.) তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন।' (আবু দাউদ : ৩০৫২)

কিন্তু ইসলামের এই শান্তির আহ্বান সত্য, সততা, ন্যায় ও ভারসাম্যের ওপর দাঁড়ানো শান্তি। এটা প্রত্যেককে প্রত্যেকের অধিকার বুঝিয়ে দেয়। অত্যাচারীকে অত্যাচার থেকে, ছিনতাইকারীকে ছিনতাই থেকে ফিরিয়ে রাখে। ইসলামে শান্তির চটকদার শ্লোগানের আড়ালে ধড়িবাজি নেই যেখানে চোরকে চুরির মাল দিয়ে দেয়া হয়। বিনিময়ে ঘরের মালিককে দেয়া হয় নামিক মূল্য!

> নবী মুহাম্মাদ সা. হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমকে জুলুম করবে বা কষ্ট দিবে, কিংবা তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিবে, শেষ দিবসের বিচারের দিন স্বয়ং নবীজী সা. তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন।

বাকি থাকলো পরিভাষার দ্বন্দ্ব ও গণমাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ। অসংখ্য মানুষ আজ নিতান্তই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে বাজারজাত করার এক সুলভ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এগুলো। প্রত্যেকটি ব্যাপার যে যার মতো করে নিজস্ব আঙ্গিকে ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছে আর সবাই সেগুলো গোগ্রাসে গিলে নিচ্ছে। কেবল হাতে গনা কিছু লোক এমন রয়েছেন, যারা বাস্তবতা খুঁজে বেড়ান। প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য মিডিয়ার প্রচারণার মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বস্তুনিষ্ঠতা ও ভারসাম্যের মানদণ্ডে সবকিছু বিচার করেন।

নিচে এসম্পর্কিত কিছু বাস্তবতা তুলে ধরা হচ্ছে :

> পৃথিবীতে হাতে গনা কিছু লোকই এমন রয়েছেন, যারা বাস্তবতা খুঁজে বেড়ান। প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য মিডিয়ার প্রচারণার মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বস্তুনিষ্ঠতা ও ভারসাম্যের মানদণ্ডে সবকিছু বিচার করেন।

ইসলাম বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ধর্ম

পাথেয়র স্বল্পতা, সামর্থ্যের অপ্রতুলতা, মুসলিমদের দুর্বলতা আর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর অহর্নিশ বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস ও হামলার পরেও আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। আমেরিকা থেকে ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে এশিয়া, গোটা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিস্ময়রক গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এ ধর্ম। অথচ ইসলামের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও নেই এমন অসংখ্য অপবাদে ন্যুব্জ তার ঘাড়। তাহলে ইসলামের এই যে বিস্তার– সেটা কি গা জোয়ারি হচ্ছে? নাকি সন্তোষ ও স্বাধীন নির্বাচনের ফলে।

যে কোনো পাঠক খুব সহজেই যে চাক্ষুষ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন তা হলো, সেসব মুসলিম কর্তৃক অন্যান্য ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষের অধিকার, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরল সম্মান প্রদর্শন– এগুলোই সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। আর এ কারণেই তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, বিদেশী মুসলিমদের স্বদেশী মানুষের সঙ্গে এই যে সদাচরণ সেটা কিন্তু তাদের নিজস্ব অনুগ্রহ ছিল না। বরং এগুলো ছিল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত শিক্ষা তাদের জীবনে বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ ফসল। ‘ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। কুপথ থেকে সুপথ স্পষ্ট হয়ে গেছে’। (বাক্বারা : ২৫৬)

মানুষকে কি ইসলামে ঢুকতে বাধ্য করা হয়েছে?

ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ নিজস্ব মতামত চাপাতে, প্রভাব খাটাতে, নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করতে শক্তি প্রয়োগ করে আসছে। বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের অনুসারীদের এমনসব ঘটনায় ইতিহাসের পাতা কালো হয়ে আছে।

ইতিহাস সাক্ষী, আবিষ্কারের নেশায় দুনিয়ার দিক-দিগন্তে ছুটে চলা (ইউরোপীয়) অভিযাত্রীরা যখন নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকা) পৌঁছলো, তখন সেখানকার আদিবাসী ও মূল অধিবাসীদের ওপর চালানো হয়েছিল ইতিহাসের হিংস্রতম গণহত্যা, বর্বরতম জাতিগত নিধন। নিজ চোখে এমন বুনো, জান্তব হিংস্রতা ও নৃশংসতম ঘটনা দেখে স্প্যানিশ ফাদার বার্তোলোমি লিখেছিলেন, ‘তারা স্থানীয় অধিবাসীদের মানুষ মনে করতো না। তাদের চোখে ওরা ছিল পশু-পাখির চেয়েও তুচ্ছ ও নগণ্য।’

A Brief Account of the Destruction of the Indies by Bartolome de las Casas (Jan 1. 2009)

তাহলে নতুন নতুন শহর বিজয়ের পরে মুসলিমরা কী করেছে?

মুসলিমরা আট শতাব্দী আন্দালুস শাসন করেছে

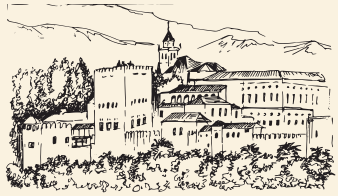

খ্রিস্টাব্দ ৭১১ থেকে শুরু করে ১৪৯২ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৮১ বছর মুসলিমরা আন্দালুস (স্পেন) শাসন করেছে। এ রাজ্য পরিণত হয়েছিল বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে। অথচ একজন খ্রিস্টানকেও তাতে ইসলামে ঢুকতে বাধ্য করা হয়নি। তাদের অধিকার ছিল সুরক্ষিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে গোটা রাজ্যে তারা ছিল প্রথম সারিতে। আন্দালুসে ইসলামের বিজয়ের আগে সেখানকার ইহুদিরা নিপীড়িত ছিল। মুসলিমরা ইহুদিদের সেই নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করেছিল। এমন শত বাস্তব ঘটনায় ইতিহাসের পাতা আজও জ্বলজ্বল করছে।

এর বিপরীতে যখন সেখানে মুসলিমদের পরাজয় ঘটলো। ইসাবেলা ও ফার্ডিনেন্ড স্পেন দখল করে নিলো। ইসলাম সেখানে পরিণত হলো নিষিদ্ধ ধর্মে। গোপনেও ইসলাম চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়লো। মুসলিমদের ধরে ধরে শাস্তি দেয়ার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড় করানো হলো প্রহসনের আদালত।

ঘড়বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো মুসলিমদের। দেশ ছাড়া করা হলো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুসলিমদের সঙ্গে ইহুদিদেরও আন্দালুস থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এসব ইহুদি তখন মুসলমানদের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। লাভ করে আশ্রয়, অভয়, নিরাপত্তা ও সম্মানজনক জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

মুসলমানরা ১৪০০ বছর মিসর শাসন করেছে। কিবতীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করেছে

ইসলামী ইতিহাসের সূচনালগ্নে যেদিন রাসূলের সাহাবী আমর ইবনুল আস (রা.) এর হাতে মিসর বিজিত হয়েছিল, সেদিন থেকে মুসলিমরা মিসর শাসন করে আসছে। সুদীর্ঘ এ সময়ে মুসলিমরা কেবল মিসরবাসীর ধর্ম ও পবিত্র জায়গাসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করেনি; বরং বিদেশী শক্তির হাত থেকেও তাদের রক্ষা করেছে। এই ধর্মের (খ্রিস্টধর্ম) অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ফিরকাগত দ্বন্দ্ব ও শাখাগত মতভেদের কারণে রোমানদের হাতে মিসরের কিবতীরা নিপীড়ন, নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার ছিল। ইসলাম এসে তাদের এই জীবন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করে। তখন থেকেই কিবতীরা ধর্ম ও বিশ্বাসগত স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করে। ফলে আজও মিসরে কিবতী খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৫০ লক্ষাধিক।

মুসলমানরা প্রায় হাজার বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে। অথচ আজও ভারতের ৮০% মানুষ অমুসলিম

সুদীর্ঘ এক হাজার বছরের কাছাকাছি সময় মুসলিম শাসকগণ দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছেন। এই বিশাল ভূখণ্ডের সকল ধর্মের মানুষের অধিকার ও পূজা-উপসনার সুরক্ষা করেছেন। নিপীড়িত ধর্মগুলোকে নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর একারণেই সকল ইতিহাসবিদ স্পষ্টভাবে বলেছেন, এখানে শক্তিবলে ইসলাম প্রচারিত হয়নি। ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে কাউকে জোর-জবরদস্তি করা হয়নি।

সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের প্রবেশ করতে কোনো যুদ্ধ কিংবা বাহিনীর প্রয়োজন হয়নি

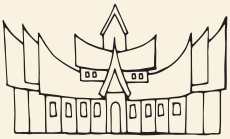

বর্তমান পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হলো ইন্দোনেশিয়া। এ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ২৫০ মিলিয়নেরও অধিক। মুসলিমদের হার শতকরা ৮৭ ভাগ। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুসলিম বণিক ও সওদাগরদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে এ ভূখণ্ডের মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। ইসলামের কোনো সেনাবাহিনী এখানে আসেনি। এক ফোঁটা রক্ত ঝরেনি। অথচ সেই ভূখণ্ডে যখন পর্তুগাল, হল্যান্ড ও সবশেষে ইংরেজদের উপনিবেশের শকুনের দল হাজির হলো, রক্তের সাগর বয়ে গিয়েছিল।

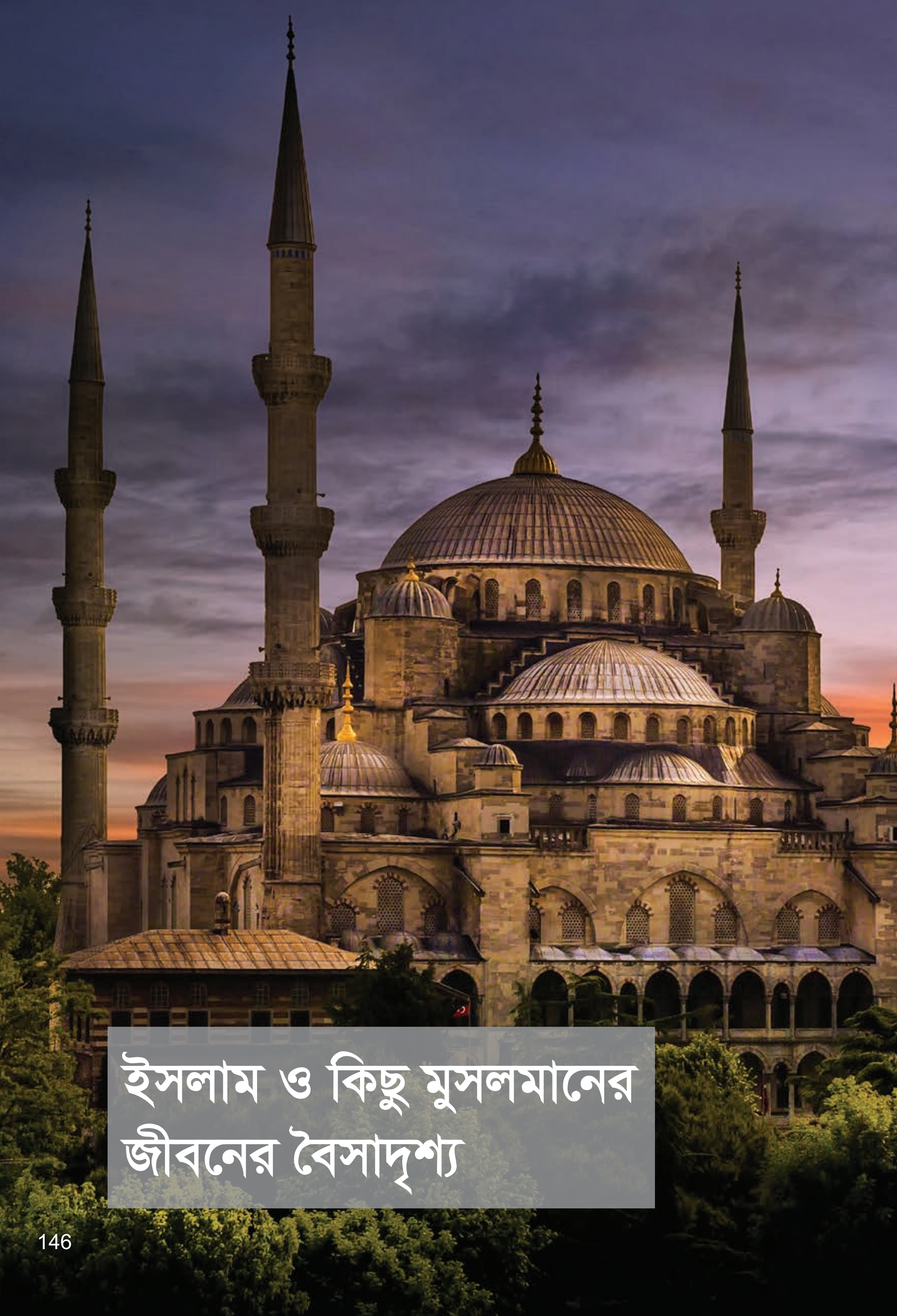

ইসলাম ও কিছু মুসলমানের জীবনের বৈসাদৃশ্য

কেন এই ভয়ংকর ফারাক? এই শোচনীয় বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কী? ইসলামের সঠিক পরিচয় লাভ করার পরে এমন প্রশ্ন যে কেউ করে থাকবেন। কেউ যখন ইসলামের প্রকৃত বিধানাবলি জানতে ও অনুভব করতে পারেন, যেগুলো মানুষকে উত্তম চরিত্র, পৃথিবীর বিনির্মাণ, মানবতার কল্যাণ ও মানুষের মাঝে শান্তির প্রসারের প্রতি আহ্বান করে। এরপর তিনি তার চারপাশের 'মুসলিম' নামের মানুষগুলোর বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তখন তিনি সহজাতভাবেই এমন প্রশ্ন করে বসবেন। তার মনে প্রশ্ন আসবে, এরা কি আসলেই সেই ধর্মের প্রকৃত অনুসারী?

কেন এই ভয়ংকর ফারাক? এই শোচনীয় বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কী? ইসলামের সঠিক পরিচয় লাভ করার পরে এমন প্রশ্ন যে কেউ করে থাকবেন। কেউ যখন ইসলামের প্রকৃত বিধানাবলি জানতে ও অনুভব করতে পারেন, যেগুলো মানুষকে উত্তম চরিত্র, পৃথিবীর বিনির্মাণ, মানবতার কল্যাণ ও মানুষের মাঝে শান্তির প্রসারের প্রতি আহ্বান করে। এরপর তিনি তার চারপাশের 'মুসলিম' নামের মানুষগুলোর বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তখন তিনি সহজাতভাবেই এমন প্রশ্ন করে বসবেন। তার মনে প্রশ্ন আসবে, এরা কি আসলেই সেই ধর্মের প্রকৃত অনুসারী?

এটি একটি জটিল প্রশ্ন : সঠিক জবাব দেয়ার আগে ঠাণ্ডা মাথায় কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে :

- ইসলামের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করলে কিংবা মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মালেই কেউ প্রকৃত মুসলিম হয়ে যায় না। আমাদের চারপাশে সর্বত্রই এমন মানুষ আছেন যারা দীনের বিধি-বিধান পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি করে থাকেন। আবার অসংখ্য মুসলিম এমন আছেন যারা ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

- মানুষের নিজস্ব কর্মকে তার ধর্মের নামে চালানো অন্যায়। কারও ব্যক্তিগত দোষে কোনো ধর্মকে দোষী করা অনুচিত ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ। সুতরাং 'হিটলার তার ধর্মে প্রভাবিত হয়ে সকল কুকর্ম করেছে', কিংবা 'খ্রিস্টধর্ম একটি সহিংস ধর্ম; কারণ হিটলার ছিল একজন খ্রিস্টান', অথবা 'নাস্তিক্যবাদ মানবহত্যার দিকে নিয়ে যায়। কারণ নাস্তিক জোসেফ স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে'- এগুলো নিতান্তই অযথার্থ, অসার, অবাস্তব ও স্থূল দাবি।

"মানুষের নিজস্ব কর্মকে তার ধর্মের নামে চালানো অন্যায়। কারও ব্যক্তিগত দোষে কোনো ধর্মকে দোষী করা অনুচিত ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

- প্রকৃত ইসলাম কী এবং সত্যিকার অনুসারীদের মাঝে ইসলামের প্রভাব কী- এর অসংখ্য উদাহরণ পৃথিবী দেখেছে। বিশ্ববাসী দেখেছে ইসলামের প্রকৃত পয়গাম মেনে কীভাবে মুসলিমরা একদা গোটা দুনিয়ায় শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির আলো জ্বালিয়েছিল। প্রাচ্যের ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের স্পেনের সীমা পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় এক আলোকিত সভ্যতা কায়েম করেছিল। যেই সভ্যতার নির্দশন আজও চোখের সামনে জ্বাজ্জ্বল্যমান। ইতিহাসের পাতা ভরপুর। বরং আজকের পৃথিবীতে এই যে আমরা বেঁচে আছি, সভ্যতার আলো প্রত্যক্ষ করছি, ইসলামী সভ্যতা ছিল আজকের সভ্যতার অগ্রদূত ও আলোকবর্তিকা। উপরন্তু বর্তমান পৃথিবীতেও অসংখ্য ইসলামী রাষ্ট্র যুগ-চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে উন্নতির দিকে ছুটে চলেছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে কোণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিমদের ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা না হয় বাদই থাকলো।
- দুয়েকজন চিকিৎসকের অপকর্ম কিংবা দুর্নীতির কারণে কেউ গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে না। আধুনিক চিকিৎসার গৌরবময় উন্নতি ও ফলাফলের কথা প্রত্যাখ্যান করে না। একইভাবে নিজস্ব পেশার প্রতি অবিচারকারী কিছু শিক্ষকের অপকর্মের কারণে কেউ গোটা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে না। ছেলে-মেয়েদের ঘরে বসিয়ে মূর্খ বানায় না। তাহলে বোঝা গেলো, কোনো ধর্ম ও কিংবা ব্যবস্থার মূলকথা কী সেটা গুরুত্বপূর্ণ; অনুসারী দাবীদারদের বিচ্ছিন্ন কর্ম নয়।

তবে বিস্ময়কর হলেও সুসংবাদ হচ্ছে এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ঘরের কিংবা বাইরের শত্রুদের পক্ষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন হামলার সত্ত্বেও ইসলাম আজও সমহিমায় ভাস্বর। অসংখ্য মানুষ আজও ইসলামের প্রকৃত পরিচয় ও নির্মল-পবিত্র রূপ উদ্ঘাটন করছেন। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন।

> নিজস্ব পেশার প্রতি অবিচারকারী কিছু প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকের অন্যায় ও বিচ্যুতির কারণে কেউ গোটা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে না। ছেলে-মেয়েদের ঘরে বসিয়ে মূর্খ বানায় না।

নতুন দিগন্ত

এমন কতবার হয়েছে যে আপনার জন্য একটি কল্যাণকর সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দোলাচলের মধ্য দিয়ে সেটা নষ্ট করে ফেলেছেন? যার ফলে আজও নিজেকে দোষী ভাবছেন?

মানুষকে সৃষ্টিকর্তা যতগুলো সম্মান ও মর্যাদার বস্তু দান করেছেন তার ভেতরে অন্যতম হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা। ফলে মানুষ ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক সম্পূর্ণ ইচ্ছামতো কোনো খটকা ও শংকা ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা, বুক খুলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া, দুরতিক্রম্য বাধার বিন্ধ্যাচলের সামনে দাঁড়িয়েও ন্যুব্জ হয়ে না পড়া নিঃসন্দেহে বিশাল সাহসের কাজ। লোক এমন মানুষের উচ্ছ্বসিত তারিফ করে। সরব সাধুবাদ জানায়। এভাবে নিজের কল্যাণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাও বিশাল সাহসের কাজ। নিজের অতীতের ভুল প্রকাশ পেলে সেটা স্বীকার করে ভবিষ্যতে সঠিক পথে হাঁটার প্রত্যয় ও সংকল্প হচ্ছে আরও বড় কাজ। নিজের আমিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবল বিক্রমে তার পতন ঘোষণা করা, আত্মগরিমার বিসর্জন দেয়া বিশাল বীরত্বের পরিচায়ক। আপাত কষ্টকর হলেও এর ফলাফল সুন্দর ও সুদূরপ্রসারী।

প্রকৃত তথ্যসূত্র থেকে ইসলামকে জানার জন্য কিছু সময় যখন আপনি বের করতে পেরেছেন, আমরা আশা করছি এখন এগুলো নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনার সময়ও আপনি বের করতে পারবেন।

এ গ্রন্থ পড়ার পরে যদি আপনার ভেতরে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও রওনক ফুটে ওঠে, বাকি আপনি এ সম্পর্কে আরও সবিস্তারে ও বিশদভবে জানতে চান, তবে আপনার সামনের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মোচিত। ইসলামের বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্য জানার জন্য এক উন্মুক্ত জগত আপনার চোখের সামনে বিদ্যমান। আপনি পড়ুন, জানুন, প্রশ্ন করুন, মতবিনিময় করুন। কিন্তু সেটা একটু ভিন্নভাবে ও ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় যেন।

GLOBAL MAP

আপনি গ্রন্থটি পড়ে শেষ করেছেন এটা আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্য ও গর্বের ব্যাপার। তবে গ্রন্থটি পড়ার পরে আপনার ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। হতে পারে সেগুলোতে আমাদের সঙ্গে আপনি একমত কিংবা দ্বিমত পোষণ করবেন। আর তাই আমরা আপনার তেমন কিছু প্রশ্ন, মতামত কিংবা দ্বিমতের কথা শুনতে চাই। আপনার যেকোনো মতামত আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে শোনার ব্যাপার অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ইসলাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে:

LAUNCHING
CURiOSiTY
JUST SCAN IT.!!

THISISLAM.net

আপনার গল্প
আমাদেরকে বলুন

info@modern-guide.com

BANGALI

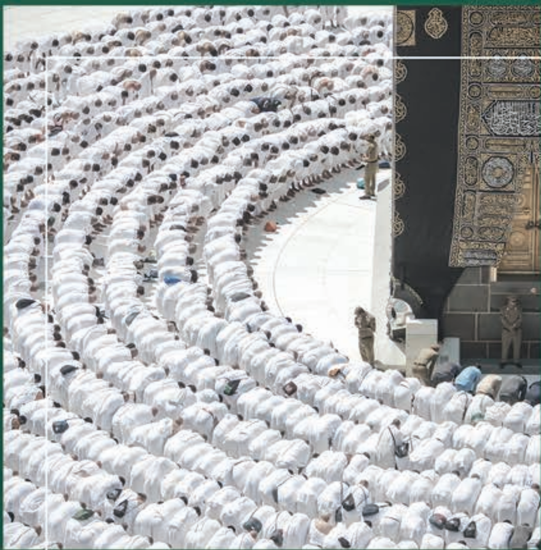

- চারপাশের গণমাধ্যমগুলো জগতের যে ধর্মটির ওপর সবচেয়ে বেশি হামলা করছে, বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালছে, আরও একটু কাছ থেকে, আরও একটু সূক্ষ্মভাবে একবার কি সেই ধর্মটির ছবিটি দেখা উচিত না?...

- গোটা দুনিয়ার পরিসংখ্যান যাকে বিশ্বের সর্বাধিক বিস্তৃত ও দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে, তাকে কি আরও একটু গভীরভাবে জানা উচিত না?

- আমাদের চারপাশের জগত, ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে অন্যদের মূল্যবোধ ও দর্শন জানার প্রতি কি আপনার কোনো আগ্রহ হয় না?

- আপনি কি একবারের জন্যও নিজেকে মূল সূত্র থেকে ইসলামের নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো জানার সুযোগ দেবেন... তারপরই না সেগুলোকে বিবেক ও যুক্তির আলোকে বিচার করবেন?..

যদি এগুলো কিংবা এর একটি বিষয়ও আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর লাগে, তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আপনাকে সেটা পেতে সহায়তা করতে পারে।

9 786030 315055

LAUNCHING CURiOSiTY
JUST SCAN IT.!!

MODERN GUIDE

THIS IS ISLAM

THISISLAM.info